দ্বিতীয় সংস্করণ
মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশিকা
অনিন্দিতা দেবী
১২৪-এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীফণীভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ
৫২।৩, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

॥ উৎসর্গ ॥

প্রশ্ন, আমরা কী সমাজের কেউ নই? এ সহজ প্রশ্নের উত্তরটা দিতে গিয়ে সুস্থ লোকদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষা, সমবেদনা, ও উদারতা, কুসংস্কারের ভ্রুকুটিতে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমরা ভুলে যাই ভারতের এই হতভাগ্য বিশ লক্ষ ভাই, বোন ও শিশু আমাদেরই পরিবারের লোক। তা'দের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, দাবী আছে এই সমাজের উপর। তাই তাদের হাতে তুলে দিলাম এই 'নতুন আলো'।

প্রয়োজন বোধে দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হল।

নাট্যকার

নতুন আলো সম্বন্ধে কে কি বলেন ঃ

নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়

"কথা সাহিত্যিক শ্রীদীপেন রাহার 'নতুন আলো' নাটিকাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। কুষ্টব্যাধিকে ভিত্তি করে লেখা নাটিকাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ঘটনার নতুনত্ব এবং সংলাপের বলিষ্ঠতায় নাটিকাটি মর্মস্পর্শী। বহু সমস্যা সংকট কণ্টকিত আমাদের জাতীয় জীবনে এমনি রসোত্তীর্ণ নাটিকার খুবই অভাব অনুভূত হয়। দীপেন বাবু সেই অভাব পূরণ করতে থাকুন, এই কামনা করি।"

আশাপূর্ণা দেবী ঃ

"সু সাহিত্যিক শ্রীদীপেন রাহার 'নতুন আলো' নাটিকাটি একটি নতুন আলো নিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কুষ্ঠ রোগী যেন একটা মহা অপরাধীর মূর্ত্তিতে সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে এসে পড়ে অবহেলার অন্ধকারে দুঃখময় ভবিষ্যতের গভীর গহ্বরে। অথচ তারাও আর সকলের মতই মানুষ। শ্রীদীপেন রাহা একাধিক রোগিণীর কথা নিয়ে চিত্রটি তুলে ধরেছেন। একে প্রচার মূলক নাটিকা বললে ভুল বলা হবে। বলিষ্ঠ সংলাপে এবং সাবলীল ভঙ্গিমায় নাটিকাটি রসোত্তীর্ণ পর্যায়ে পড়ে। লেখকের কলমে আছে শক্তি, মনে আছে দরদ নাটিকাটিতে তার স্বাক্ষর পেলাম। শ্রীরাহা সমাজের একটি অন্ধকার কক্ষে যে আলো ফেলেছেন তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। নাটিকাটির বহুল প্রচার নিতান্ত আবশ্যক।"

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

আমি "নতুন আলো" পড়িয়াছি। বেশ ভাল লাগিল। নাটকের সৌন্দর্য ও সংলাপের মাধুর্য বজায় রাখিয়া একটী

গুরুতর সমস্যার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। আপনার সাহিত্য সাধনা সার্থক।"

শ্রীহিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ঃ ভাইসচ্যান্সেলর, রবীন্দ্র ভারতী।

শ্রীদীপেন রাহার 'নতুন আলো' নাটিকাটি ভাল লেগেছে। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর সমস্যাকে লেখক সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করেছেন। তাব লেখায় ভবিষ্যত সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী—সদস্য, লোকসভা।

"শ্রীদীপেন রাহা কুষ্ঠ ব্যাধির উপর যে সহানুভূতি ও কার্যকবী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন তা' সব দিক দিয়েই সমাজের কল্যাণ করবে। শ্রীরাহা তা'ব নাটিকার মাধ্যমে গল্পে, প্রবন্ধে ও বেতারে সমাজের ষ্টীগমা দূবীকবণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে দেশের নিশ্চয়ই উপকার হবে। নাটিকাটিব বহুল প্রচার কামনা করি। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হলে আরো উপকার হবে। পশ্চিমবঙ্গের লোক রঞ্জন শাখা আশা করি নাটিকাটির রূপ দিয়ে পূর্ণ মর্যাদা দেবেন।

শ্রীরাহাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

জ্যোতির্ময়ী দেবী ঃ

"সমাজের একটি বিভিষিকাময় অথচ উপেক্ষিত অবজ্ঞাত রোগেব কথা নিয়ে রচিত 'নতুন আলো' সামাজিক মানুষের মনে কুসংস্কার ও তার আতঙ্কের চিত্র নিয়ে এই নাটিকাটি লেখা হয়েছে। যে রোগ বিভীষিকা জাগায় মনে, ছোঁয়াচের আতঙ্ক

জাগায় মনে সে রোগ নিদারুণ এবং এখন তা সারানো যে শিবের অসাধ্য নয়, এই সম্বন্ধে লেখক নতুন আলোক পাত করেছেন।

এই নাটিকাটি সমাজ কল্যাণ বিভাগের দ্বারা প্রচার ও অভিনীত হওয়া উচিত। এতে সত্যিই সমাজের কল্যাণ হবে।”

ডাঃ নীহার কুমার মুন্সী, এম, বি, ডি, ও, এম, এস (লণ্ডন)

“আধিব্যাধিতে” ‘নতুন আলোর’ প্রকাশ দেখেছি। সেটা খুবই সময়োচিত হয়েছে। এই রোগ যে সারতে পারে এবং রোগীরা স্বাভাবিক মানুষের মতন জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে একথা সোচ্চারে না জানাতে পারলে আমাদের এত-দিনকার কুসংস্কার এবং ভয় দূর হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

নাটিকাটি এই দিক দিয়ে খুবই কার্যকরী হবে। মেডিকেল কলেজগুলির উৎসব উপলক্ষে এই নাটিকা মঞ্চস্থ করলে এর উদ্দেশ্য প্রচার হবে।”

ডঃ এইচ, এল, দে, এম, এ ; ডি এস, সি (ইকন), লণ্ডন।

প্রাক্তন পরিচালক, আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা,
ওয়াশিংটন, ডি, সি, যুক্তরাষ্ট্র।

“প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শ্রীদীপেন রাহার ‘নতুন আলো’ একাঙ্ক নাটিকা বিশাল সমাজ দেহের একটি গুরুতর ব্যাধি সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করেছে। এই নাটিকার বহুল প্রচার জাতির পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের অন্যান্য সাহিত্যিকরাও এই মহতী চেষ্টার সমর্থন করবেন।”

শ্রীমতী বিভা সরকার : সম্পাদিকা, পি, ই, এন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, কলিকাতা-১৯। (২৮-৩-১৯৬৬।)

"দীপেন বাবুর 'নতুন আলো' নাটিকাটি সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে সত্যই নতুন আলো জ্বালছে। সমস্ত নাটিকাটির মধ্যে নাট্যকারের একান্ত মানব দরদী পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পরিব্যপ্ত। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দিলেন। অবহেলিত ভাগ্য বিড়ম্বিত কুষ্ঠ রোগীদের নিয়ে এমনি মানবিক নাটিকা আমি বাংলা ভাষায় এর আগে পড়িনি। নাটিকাটি শেষ করার পরেও মনের মধ্যে এই সব বিধি বিড়ম্বিতদের জন্য একটা গভীর বেদনা বোধ ও সহানুভূতি জেগে থাকে। নাটিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।"

ডাঃ পার্বতী চরণ সেন, এম, বি,
সম্পাদক, হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ,
পশ্চিমবঙ্গ শাখা, কলিকাতা।

"১৩৭১ সালে বিষ্ণুপুরে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে আমি কুষ্ঠরোগ বিমুক্তদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহূত হই। অধিবেশনের ডেলিগেটদের বাঁকুড়া শহরে নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একমাত্র কুষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গৌরীপুর কলোনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। উভয় স্থানেই শ্রীরাহার সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করি এবং আমাদের দেশের শত শত ছিন্নমূল কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ও আগ্রহ লক্ষ্য করে আসছি। কুষ্ঠ কর্মী হিসেবে আমি যে কত আনন্দ লাভ করেছি তা বলাই বাহুল্য।

কিছুদিন পর "নতুন আলো" নামে লেখা নাটিকাটি স্বাস্থ্য পত্রিকা "আধি ব্যাধিতে" ধারাবাহিক ভাবে দুই সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় এবং পরে কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানে পরপর দুইবার অভিনীত হয়। নাটিকাটি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেবিষয়ে সুনিশ্চিত। নাটিকাটির বহুল প্রচার হোক ও আমাদের দেশবাসীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে কুষ্ঠ সম্বন্ধে 'নতুন আলো' সঞ্চারিত হোক একান্ত ভাবে কামনা করি। শ্রীযুক্ত রাহা কুষ্ঠ সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন এবং রেডিওতে স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি পাঠ করেছেন। সেই জন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

চরিত্র

[পুরুষ]

রমেন সেন—	নববিষ্ণুপুর স্কুল শিক্ষক।
বিশু ডাক্তার—	স্থানীয় ডাক্তার।
ডাঃ শিশির মিত্র—	সদর হাসপাতালের ডাক্তার।
রতন, বীরু, বিশ্বনাথ, সমীর, জিতেন, সুশোভন, প্রভাস,	সদর হাসপাতালের রোগীগণ।
ডাঃ সমর রায়—	কলকাতার জনৈক যুবক ডাক্তার
সুখেন সোম—	ডাঃ সমব রায়ের বন্ধু।
পিওন—	হাসপাতালের পিওন।

[স্ত্রী]

বিভাবতী—	(বিধবা) রমেন সেনের মা।
বীণা—	ঐ স্ত্রী
সুষমা—, শান্তা—	সদর হাসপাতালের রোগিণীদ্বয়।
মনীষা—	সুখেনের বোন।
সুলতা দেবী—	(বিধবা) বিভাবতীর প্রতিবেশিনী

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[রমেন সেন, এম. এ। বয়স আটাশ। নব বিষ্ণুপুর স্কুলের শিক্ষক। স্ত্রী বীণা। যুবতী। অপরূপ সুন্দরী। কোলে দেড় বছরের শিশু খোকন। রমেন তক্তপোশের উপর বসে। অদূরে একটা টুলের উপর বীণা। সময় সন্ধ্যা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিজেদের ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে।

রমেন ঃ তোমার রূপ দেখে বন্ধুবান্ধব আমায় হিংসে করে।

বীণা ঃ (একটু হেসে) তুমি নিজে কী মনে কর ?

রমেন ঃ নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করি। এমন স্ত্রী ক'জনের ভাগ্যে ঘটে। রূপে সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী।

বীণা ঃ রূপটা সবাই ভালো করে দেখে। এই রূপের জোরেই নাকি সেনবংশের বউ হতে পেরেছি। যদি রূপটা কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আকর্ষণটা জিরো ডিগ্রীতে নেবে যাবে।

রমেন ঃ তা কেন ? রূপটা গেলেও গুণটা থাকবে তো। জান তো রূপজ প্রেমের চাইতে গুণজ প্রেম অনেক বড়, অনেক বেশি স্থায়ী।

বীণা ঃ মনে থাকে যেন।

রমেন ঃ কেন ? তুমি রূপটাকে নষ্ট করার জন্যে কোন প্রক্রিয়া অভ্যাস করছ নাকি ?

বীণা ঃ আমি অভ্যাস কবতে যাব কেন ? গায়ে, হাতে ফিকে রং-এর কী সব দাগ হয়েছে। তুমি সেদিন ঠাট্টা করে বললে, চিতে বাঘ।

রমেন ঃ ব্যাকরণে আমি বরাবরই কাঁচা, বলা উচিত ছিল চিতা বাঘিনী।

বীণা ঃ তা বাঘিনীকে ঘরে রাখার কী দরকার ?

রমেন ঃ এ মস্ত বড় প্রশ্ন। তুলসীদাস বলেছেন—

'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে
দুনিয়ামে সব বাঁওরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।'

[সশব্দে হেসে উঠল রমেন]

বীণা ঃ (শ্লেষের সঙ্গে) মেষ কখনও বাঘ পুষতে পারে ?

রমেন ঃ পুরুষকে তুমি মেষ বলছো ?

বীণা ঃ পুরুষকে নয়, কাপুরুষদের।

রমেন ঃ যথা ?

বীণা ঃ যেমন ধর তুমি। আজ ক'দিন ধরে বলছি, কোলকাতায় মেজদির বাড়ি ঘুরে আসি। তুমি

কিছুতেই মাকে বলতে চাইছ না পাছে মা অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে। আচ্ছা বীর যাহোক।

রমেন ঃ আচ্ছা বীরাঙ্গনা, মনে পড়ে সেদিন মা'র কাছ থেকে, অর্থাৎ ঠাকুর ঘর থেকে দিয়াশলাইটা আনতে বলেছিলাম। পেরেছিলে ?

বীণা ঃ বা রে ! ঠাকুর ঘরের জিনিস কি চুরি করতে আছে ? বিশেষ করে বিড়ি-সিগারেটের ইন্ধন ?

রমেন ঃ বুঝেছি তোমার হিম্মত। আর সাফাই গাইতে হবে না।

বীণা ঃ তোমার হিম্মতও বুঝতে আমার বাকি নেই।

রমেন ঃ যথা ?

বীণা ঃ আজ কদিন হলো একটা ওষুধ আনতে বলছি। কই, এল ? তারপর সারা গা ছড়িয়ে পড়লে কত রকম নামকরণ হবে, ঠাট্টা হবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হবে তার ঠিকানা নেই।

রমেন ঃ বাজার থেকে যা তা ওষুধ আনতে নেই। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে পরামর্শ করে আনা ভালো। তাই বিশুদাকে আসতে বলেছি।

বীণা ঃ মশা মারতে কামান দাগানো। ছুলির জন্যে বিশু ডাক্তার। 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না'—মহাজন বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

[সাইকেলের বেলের শব্দ হল]

রমেন ঃ বিশুদা বোধহয় এসে গেছেন।

বিশু ঃ রমেন বাড়ী আছ ?

রমেন ঃ আছি। আসুন দাদা।

[বিশু ডাক্তারের প্রবেশ। রমেন ও বীণা উঠে দাঁড়াল]

বিশু ঃ এদিকে আর একটা কেস দেখতে এসেছিলাম। তাই ভাবলাম ভায়ার ওখানটা একবার হয়েই যাই।

রমেন ঃ খানিকক্ষণ আগে আপনার কথাই বলছিলাম।

বিশু ঃ হঠাৎ এই গেঁয়ো ডাক্তারকে ? খোকনের অসুখ হয়েছে নাকি ? সে কেমন আছে ?

রমেন ঃ সে ভালোই আছে। মা'র ঘরে ঘুমুচ্ছে। আমি বীণাকে বলছিলাম, ছুলির ওষুধ পত্র বাজার থেকে অমনি কিনে আনা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শমত কেনা উচিত।

বিশু ঃ যথার্থই বলেছ ভায়া। কত রকম বাজে ওষুধ

বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। তা' ছাড়া টোটকার অন্ত নেই। (একটু এগিয়ে গিয়ে) দেখি বৌমা, কোন হাতে হয়েছে ?

[বীণা ডান হাতখানা বাড়ালো। ডাক্তার খুব ভালো করে দেখে নিল দাগগুলো। চোখ দুটো তার হঠাৎ বড় হয়ে উঠল। বীণা লক্ষ্য করেনি, সে মাথা নীচু করে ছিল]

রমেন ঃ কী হলো দাদা ?

বিশু ঃ বলছি।

[রমেন বীণাকে ইঙ্গিতে জানালো চা নিয়ে আসতে। বীণার প্রস্থান]

বিশু ঃ কতদিন হলো এ দাগগুলো দেখা দিয়েছে ?

রমেন ঃ চার পাঁচদিন হবে।

বিশু ঃ যাক্ খুব বেশি দেরি হয়নি।

রমেন ঃ কী বলছেন দাদা! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে ?

বিশু ঃ তুমি যাকে ছুলি বলে মনে করছ, আমার অভিজ্ঞতা ঠিক তা বলছে না। কঠিন ব্যাধির লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। তবে প্রথম অবস্থা, তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। ভয় নেই।

রমেন ঃ খুলে বলুন দাদা। আমার ভালো মনে হচ্ছে

বিশু ঃ না। তুমি উচ্চ শিক্ষিত যুবক। তোমার কাছে গোপন করে লাভ নেই। আমার মনে হয় এগুলো কুষ্ঠের লক্ষণ।

রমেন ঃ (সচকিত ভাবে) বলেন কি ? কুষ্ঠ! অসম্ভব, হতেই পারে না। এ রোগ এ বাড়িতে আসতেই পারে না। কারো কখনও হয়নি।

বিশু ঃ উতলা হয়ো না ভায়া। চেঁচামেচি করলে জানাজানি হবে। জান তো পাড়া গাঁ। তিলকে তাল করতে বেশি সময় লাগবে না। তার চাইতে বৌমাকে সদরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। কয়েকমাসের মধ্যেই ভালো হয়ে ফিরবে। আর খোকনকে দূরে সরিয়ে রাখবে বৌমার কাছ থেকে। কারণ শিশু এ-রোগের সহজ শিকার।

রমেন ঃ আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন দাদা।

বিশু ঃ হ্যাঁ, ভুল আমারও হতে পারে। তাই বলছি সদরে গিয়ে অথবা গৌরীপুর হাসপাতালে একবার দেখিয়ে নিয়ে এস। (একটু থেমে) তবে এ রোগের ডাক্তারি বহুদিন করেছি।

আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। কথায় বলে সন্দেহের শেষ রাখতে নেই ভায়া।

[চোখে মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল রমেনের]

রমেন ঃ দাদা কি হবে ? আমি যে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। আমার মাথার ভেতরটা কি রকম যেন করছে।

বিশু ঃ তুমি মুষড়ে পড়লে বাড়ির সবাই ভেঙ্গে পড়বে। রোগ হলে আরোগ্যের ব্যবস্থা করতেই হবে। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আর বৌমাও লেখাপড়া জানা মেয়ে। তাকে বুঝিয়ে বলো রোগের গুরুত্বটা। (হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, আজ আসি, আরও কয়েকটা বাড়ি ঘুরে যেতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, যদি সদরে যাও তবে আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যেও। ডাঃ মিত্রকে আমি লিখে দেব।

[বেরিয়ে গেল বিশু ডাক্তার। রমেন বজ্রাহতের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইল তক্তপোশের উপর। চা-খাবার নিয়ে প্রবেশ করল বীণা]

বীণা ঃ বিশুদা চলে গেলেন নাকি ? তুমি অমন করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ কেন ? কী হলো ?

[চা-খাবারের ডিশটা টুলের ওপর রেখে বীণা স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল]

বীণা ঃ কী, চুপ করে আছ কেন ? কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখের চেহারা ও রকম হয়েছে কেন ? কী হয়েছে বল না আমায় !

[রমেনের গায়ে নাড়া দিল বীণা]

রমেন ঃ আমাকে একটু একা থাকতে দাও, ভাবতে দাও বীণা। হঠাৎ আমার শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে।

বীণা ঃ সে আবার কি ! না, না। তোমার শরীর খারাপ হয়নি। বাজে কথা। নিশ্চয়ই বিশুদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে, ঝগড়া হয়েছে, বিবাদ হয়েছে। তোমার চেঁচান একবার আমি শুনতেও পেয়েছিলাম। সত্যি করে বল কী হয়েছে ?

রমেন ঃ স্থির হয়ে বসো, বলছি ! শুনে হয়ত আকাশ থেকে পড়বে। কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না। বিপদের সঙ্গে যুঝতে হবে বীণা।

বীণা ঃ অত ভূমিকা আমার ভালো লাগে না। চট করে বলে ফেল কি ব্যাপার !

রমেন ঃ সইতে পারবে কিনা জানিনে। তবুও ডাক্তারের কথামত তোমাকে জানানো দরকার।

বীণা ঃ দোহাই তোমার বলো, বলে ফেল। আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করছে।

রমেন ঃ (ইতঃস্তত করে) অন্য কারো কিছু হয়নি। বিশুদা বলেছেন, তোমার হাতের দাগগুলো ছুলির নয়।

বীণা ঃ তবে কী ওগুলো ?

রমেন ঃ ওগুলো হয় তো কুষ্ঠ !

বীণা ঃ বলো কি ?

[আতঙ্কে শিউরে উঠল বীণা। দু পা পিছিয়ে গেল]

রমেন ঃ বিশুদা বললেন, সদর হাসপাতাল গিয়ে দেখিয়ে আনতে আর খোকাকে তোমার কাছ থেকে আলাদা রাখতে। বাচ্চারা নাকি এ রোগের সহজ শিকার।

বীণা ঃ [উত্তেজিত হয়ে] মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে হাতুড়ে বিশু ডাক্তারের কথা। কিছুতেই না। সব বুজরুকি, ধাপ্পা।

রমেন ঃ বিশ্বাস কর বা নাই কর, একবার শহরে গিয়ে দেখিয়ে আসতে ক্ষতি কী ?

বীণা ঃ (উত্তেজিত হয়ে) জানি, সব শেয়ালের এক রা। এক ডাক্তার বললে সব ডাক্তারই তা'তে সায় দেবে।

রমেন ঃ এ তোমার রাগের কথা। বিশু ডাক্তার আমাদের শত্রু নয়। আমাদের ভালোর জন্যেই উপদেশ দেন। ফি পর্যন্ত নেন না।

বীণা ঃ (দৃঢ়তাব সঙ্গে) না, আমি কোথাও যেতে চাইনে, কাউকে দেখাতে চাইনে। আমি এ বাড়ি ছেড়ে, খোকনকে ছেড়ে এক পা বাইরে যাব না। তোমরা খোকনকে আমার কাছ ছাড়া করার মতলব করছ। আমি এতদিন বুঝতে পারিনি।

রমেন ঃ ভুল বুঝোনা, লক্ষ্মীটি। সত্যি-মিথ্যের ভঞ্জন করে নেওয়াই ভালো। কয়েক ঘণ্টার তো পথ। চল কাল সকালেই যাই। তোমার নিজের, খোকনেব ও পরিবারের পাঁচজনের মঙ্গলের জন্যে এটুকু করা উচিত। বিশুদা বললেন, বৌমা লেখাপড়া জানা মেয়ে, বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয়ই গুরুত্বটা বুঝতে পারবে। আমারও বিশ্বাস…

বীণা ঃ না, না, আমি তোমাদের নীতিকথা শুনতে

চাইনে। (ব্যস্ততার সঙ্গে) যাই খোকনকে নিয়ে আসি মার কাছ থেকে।

রমেন : [এগিয়ে গিয়ে বীণার হাত ধরে] লক্ষ্মীটি পাগলামো করো না। বিশুদা বার বার সাবধান করে গেছেন শিশুকে দূরে রাখতেই হবে পরিবারের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্যে।

বীণা : না, আমি আর ভাবতে পারছিনে। মাথার ভিতরটা কী রকম করছে।

[রমেন বীণাকে ধরে এনে খাটে শুইয়ে দিল। তারপর ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা হাত পাখা নিয়ে এল। বিভাদেবী সশঙ্কিত ভাবে রমেনের পিছু পিছু ঘরে ঢুকলেন]

বিভা : কী হলো! ও রকম করে ছুটে গিয়ে হাত পাখা নিয়ে এলি কেন? বৌমার কী হয়েচে? এই তো খানিক আগে চা তৈরী করে নিয়ে এল বিশু ডাক্তারের জন্যে।

[ততক্ষণে বীণা মূর্চ্ছা গিয়েছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে, রমেন ক্রমাগত পাখার হাওয়া করে চলেছে]

বিভা : (উৎকণ্ঠিত ভাবে) মূর্চ্ছা গেল নাকি! এ রকম

তো কখনো আর হয়নি। বিশু ডাক্তারকে ডেকে পাঠা। দে পাখাটা আমার হাতে।

রমেন : ডাক্তার ডাকতে হবে না মা। তুমি বরঞ্চ এক বাটি জল ও ফর্সা ন্যাকড়া একটু নিয়ে এস। একটু জলের ঝাপটা দিই। এক্ষুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

বিভা : (স্বগতঃ) এ কি গেরো রে বাবা! কিছুই বুঝতে পারছিনে।

[বলতে বলতে প্রস্থান। খানিক পরে জল ও ন্যাকড়া নিয়ে এসে হাজির হলেন বিভাবতী। রমেন বীণার চোখে মুখে ক্রমাগত জলের ঝাপটা দিতে লাগল]

রমেন : চিন্তার কারণ নেই, এক্ষুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

বিভা : কী হয়েছে, কেনই বা এমন হলো? খুলে বল বাবা।

রমেন : পরে সব বলছি। এখন তুমি তোমার ঘরে যাও। খোকনকে আগলাও। সে কাঁদচে মনে হচ্ছে। বোধ হয় ঘুম থেকে উঠেছে।

বিভা : আমার যত জ্বালা। কোন দিকে যাই, কাকে দেখি।

[প্রস্থান]

(ধীরে ধীরে বীণার জ্ঞান ফিরে এল)

বীণা : (ক্ষীণ স্বরে) আমি কোথায় ? কী হয়েছিল আমার ?

রমেন তুমি বাড়িতেই আছ। কিছু হয়নি তোমার। এমনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে।

[বীণা উঠে বসবার চেষ্টা করতেই রমেন তাকে ধরে শুইয়ে দিল]

লক্ষ্মীটি, শুয়ে থাক। এখন উঠো না। শরীরটা আবার খারাপ হয়ে পড়বে।

[বীণা গভীর ভাবে পূর্বের ঘটনা স্মরণ করতে চেষ্টা করল। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল]

বীণা : (উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে) কেবল চক্রান্ত আর চক্রান্ত। আমার খোকন কোথায় ?

রমেন : (শান্ত ধীর কণ্ঠে) সে মার ঘরে ঘুমুচ্ছে।

বীণা : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। সে আমার ঘরে আমার কাছে থাকবে। অন্য কারো কাছে থাকবে না।

রমেন : (ধীর কণ্ঠে) বেশ তাই হবে। তুমি একটু স্থির হও। ঘুম ভাঙলেই নিয়ে আসব।

বীণা ঃ ওসব তোমার স্তোক বাক্য। যাই

(খাট থেকে নামার জন্য উদ্যত। রমেন এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে)

রমেন ঃ লক্ষ্মীটি, ওরকম কর না। আবার শরীর খারাপ হবে। দোহাই তোমার।

বীণা ঃ শরীর আর শরীর! ও শরীর দিয়ে কী হবে? এই তো ব্যাধি হয়েছে, বাড়ির সকলের আচরণ সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে।

(বলতে বলতে গলার স্বর বুজে এল)

রমেন ঃ তুমি অত মুষড়ে পড়লে কেন বলত? সদরের ডাক্তার দেখুক, বলুক। বিশু ডাক্তারের কথার কী দাম আছে? আর ও জানেই বা কী!

বীণা ঃ (অভিমানের স্বরে) ওর কথার উপরই তোমরা মা-বেটা যা কাণ্ড করছ, সদরের ডাক্তার বললে, আমায় তোমরা বাড়ির বা'র করে দেবে।

রমেন ঃ বেশ, দেখে নিয়ো তখন কী করি!

বীণা ঃ (বিদ্রূপের স্বরে) কী করি! আর দশজন স্বামী যা করে তাই করবে।

রমেন ঃ মানে?

বীণা ঃ মানে অতি সোজা। অত কঠিন কঠিন কথার

মানে জান আর এর মানে জান না; বোঝ না? যারা জেগে ঘুমোয় তাদের ঘুম ভাঙানো যায় না।

রমেন: (বিরক্ত হয়ে) কী আবল তাবল বকচ?

বীণা: আবল তাবল নয়। সত্যিই বলছি। শিশু পুত্র ও বিধবা মায়ের দেখা শোনা করার দোহাই দিয়ে আর একটি বিয়ে করে বসবে। তুমি ভালো করেই জান, আমি দাবী জানিয়ে কোর্ট-কাছারি করব না। কাজেই—

রমেন: দেখছি, তুমি এ সব আজগুবি কল্পনা করে মাথাটাকে আরো খারাপ করছ। (একটু থেমে) আমি বলছি, বিশ্বাস কর, তোমার কুষ্ঠ রোগ হয়নি, হতে পারে না। ও-সব বিশু ডাক্তারের ভুল ধারণা।

বীণা: সত্যিই তাই যদি মনে করতে তাহলে কোলের ছেলেকে আলাদা করে দিতে না। আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে না।

রমেন: খোকন আজ প্রথম মা'র কাছে থাকেনি। এর আগে কতদিন কতবার মা'র কাছে রয়েছে। তুমি অনর্থক এর কদর্থ করছ।

বীণা : আমি কদর্থ করছিনে। তোমরাই আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছ।

রমেন : (খাট থেকে নেমে বিরক্তির স্বরে—স্বগতঃ) অসহ্য।

বীণা : কী হল ?

রমেন : কিচ্ছু হয়নি। আমার একটু কাজ আছে, বেরুব।

বীণা : (নরম কণ্ঠে) এই ভর দুপুরে ? চান খাওয়া কিছুই যে হয়নি। চানটা চট করে সেরে নাও। আমি উঠে ভাত দেব—অবশ্যিই যদি আপত্তি না থাকে।

রমেন : সারা জীবন যার হাতে খেতে হবে তার হাতে এখন খেতে আপত্তি করলে চলবে কেন ? আর, আর অপরের হাতের খাবার এ মুখে রুচবে কিনা তাও সন্দেহ।

বীণা : (হেসে) বেশ খোশামোদ করতে শিখেছ দেখছি।

রমেন : যা একটু তোমার দৌলতেই শিখেছি, তা'ও সব সময় মনে থাকে না।

বীণা : (হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে) আমি খোশামোদের ধার ধারিনে, আর তোমার মতো অভিনয়ও

করিনে! বাইরে যাবার নাম করে মা'র কাছে গিয়ে সলাপরামর্শ করা, কী করে এ আপদটাকে এড়ানো যায়! আমি সব বুঝি, জানি।

রমেন (রাগত ভাবে) তুমি কিছু বোঝ না। জগতের খারাপ দিকটাই ভাবতে শিখেছ, ভালোর দিকটা নজরে পড়ে না। (একটু থেমে) ছেলে মা'র সঙ্গে পরামর্শ করবে না তো কি বৌ-এর সঙ্গে পরামর্শ করবে!

বীণা (হেসে) তোমাকে রাগলে কিন্তু বেশ দেখায়। পৌরুষ ভাবটা যেন ফুটে ওঠে চোখে মুখে।

রমেন অসহ্য তোমার ব্যঙ্গ, ঠাট্টা তামাশা! সব জিনিসের একটা সীমা আছে। আশ্চর্য! সময় অসময় জ্ঞান নেই। এদিকে আমার দিনে বিশ্রাম নেই, রাতে ঘুম নেই।

বীণা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে) আমি খুব সুখে আছি না? সেই থেকে শুরু হয়েছে তোমাদের চাপা কণ্ঠে কথা, সলাপরামর্শ। তার উপর—

রমেন সলাপরামর্শ করছি, বেশ করছি। তবে জেনে

রাখ, বৌকে তাড়াবার জন্যে মা'র সঙ্গে পরামর্শ এ বাড়ির ছেলেরা করে না। সে শিক্ষা তারা পায়নি। আর বৌ-এর সঙ্গে পরামর্শ করে মাকেও তাড়ায় না। এ সব রেওয়াজ অন্য কোথাও থাকলেও এখানে নেই।

বীণা ঃ (একটু চেঁচিয়ে) চমৎকার ডায়ালগ, ততোধিক চমৎকার তোমার পার্ট। (কণ্ঠস্বর নরম করে) এক কালে তুমি নাকি ভালো অভিনয় করতে। পুরস্কারও পেয়েছ। তার আক্ষরিক সত্যতার প্রমাণ আজ পেলাম। এতদিন শুনে এসেছি মেয়েরা আজন্ম নায়িকা, এখন দেখছি পুরুষরা কম যায় না। [ঠোঁঠের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।]

রমেন ঃ অসহ্য।

(হঠাৎ বিভাবতীর পুনঃ প্রবেশ। বীণা শাড়ির আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে ঘোমটা দিল।)

বিভাবতী ঃ (ব্যস্ততার সঙ্গে)

আবার চেঁচামেচি কিসের? কি হল?

রমেন ঃ কিছু হয়নি মা। তুমি তোমার ঘরে যাও।

বিভা ঃ কোন কিছু না ঘটলে অমনি চেঁচামেচি হয়? তুই আমায় কচি খুকী পেয়েছিস!

রমেন ঃ অসহ্য। (ঘন ঘন পায়চারী করতে করতে)

বিভা ঃ (বীণাকে) বৌমা, কী হয়েছে খুলে বল তো ! এমনি করে বাদ-বিসম্বাদ করলে কী লাভ হবে শুনি ? প্রতিবেশীরা মন্দ বলবে। এ তো আর কোলকাতার ফ্ল্যাট বাড়ি নয় যে, কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না। বল কী ব্যাপার ?

রমেন ঃ (বিভাবতীকে)

ব্যাপারটা খুবই সামান্য। বীণা জিদ করছে খোকনকে তার কাছে এক্ষুনি এনে দিতে হবে। আমি বলছি সে ঘুমুচ্ছে, পরে আনব'খন।

বিভা ঃ (বীণাকে) তুমি লেখা পড়া জানা মেয়ে। আমাদের মতো সেকেলে মুখ্যু-স্থখ্যু নও। শিশুর কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে জোর করে নিয়ে আসা কি ঠিক ? না কেউ এমন ভাবে আনে ?

বীণা ঃ অনেকক্ষণ দেখিনি সেই জন্যে বলছিলাম। তা' ছাড়া…

বিভা ঃ (অসন্তুষ্টির ভাবে)

তা'ছাড়া কী বৌমা ? বলতে বলতে থেমে গেলে কেন ?

রমেন ঃ মা, চুপ কর।

বভাবতী ঃ (হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে)

তোদের এ সংসারে এসে চুপ করেই আছি বাবা। চুপ করে দাসী-বাঁদীর মতো খেটে যাচ্ছি। কিন্তু আর নয়। কোন কথার কী ঝাঁঝ তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

বীণা ঃ (বিভাবতীকে) আমি তো কিছু অন্যায় বলিনি।

বিভাবতী ঃ (বিরক্ত হয়ে) না, তোমরা কেউ কিছু অন্যায় কথা বল না, অন্যায় কর না। শুধু আমিই করি। বেশ তোমার ছেলে তুমি চাও, নিয়ে নাও। আমার কিছু ভাববার নেই, কইবারও নেই। তবে একটা কথা মনে রেখ বৌমা, দেয়ালেরও কান আছে। তা' ছাড়া এ নেহাৎ পাড়া গাঁ। (একটু থেমে) আর একটা কথা। খানিকক্ষণ আগে শোভার মা জানিয়ে গেল, সে এ বাড়িতে আর কাজ করবে না। এমন কি পোড়া-বাসনও মাজবে না।

(ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান)

রমেন ঃ আশ্চর্য !

বীণা ঃ (রাগত ভাবে) তুমি সেই এক কথাই শিখেছ,

আশ্চর্য আর আশ্চর্য! এদিকে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছ কী ঘ'টছে। কে বা কা'রা আমার অসুখের সন্দেহের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে?

রমেন : আশ্চর্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে ছড়িয়ে পড়ল গুজবটা!

বীণা : তোমাদের আচরণেই টের পেয়ে গেছে শোভার মা। নয়ত তোমার মা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রমেন : মা'র নামে ও রকম যা' তা' কথা বল না বীণা। আমার মাকে আমি বিলক্ষণ জানি। তিনি কখনও এমন ছোট নন যে নিজের ঘরের কথা বাইরের লোককে বলে বেড়াবেন।

বীণা : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সবই আমার অদৃষ্ট! ধীরে ধীরে সবাই এ বাড়ী ছেড়ে যাবে। তোমায়, আমায়, খোকনকে, সবাইকে। (দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কান্নাটা লুকোবার চেষ্টা করল। রমেন এগিয়ে গিয়ে মাথাটা তুলে ধরে)

রমেন : লক্ষ্মীটি, ছিঃ এমন করে ভেঙে পড়তে নেই। তুমি ভেঙে পড়লে আর সবাই ভেঙে পড়বে। লোকের সন্দেহটা কায়েম হয়ে পড়বে। একটু

শক্ত হও, ধৈর্য ধর। বিপদে ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতাই পরম সম্বল। সংসারে কেউ যদি তোমার পাশে না থাকে না থাক, আমি তো আছি। ভাবনা কি ? ওঠ, আমার হাত ধর।

[পর্দা নামল]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

স্থান ঃ—কুষ্ঠ হাসপাতাল

[বীণা তার নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করল। একটি ছোকরা চাকর বিছানা-পত্র ও সুটকেস বয়ে নিয়ে এল। ঘরে তিনটি তক্তপোশ। অন্য দুটিতে থাকে সুষমা পাল ও শান্তা রক্ষিত।]

সুষমা ঃ দেখ শান্তা, এই নতুন রুগীটি কী সুন্দর দেখতে !

শান্তা ঃ চুপ ! এসে পড়েছে।

[বীণা ঘরে ঢুকে খালি তক্তপোশের উপর বসে পড়ল। পেছন পেছন প্রধান ডাক্তার শিশির মিত্র ঢুকলেন।]

ডাঃ মিত্র ঃ এই আপনার বেড।

(সুষমা ও শান্তাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে) এঁরা দু'জনও এ ঘরে থাকেন। আপনারা তিনজনই ডাক্তারের অবজারভেশনে থাকবেন। কোন চিন্তার কারণ নেই। কোন কিছু জানতে হলে বা প্রয়োজন বোধ করলে আমাদের অফিসে খবর দেবেন। অথবা সরাসরি আমাকে বলবেন। সঙ্কোচ করবেন না। অন্য কারোর পরামর্শ নেবেন না। সাবধান।

বীণা : উনি কি চলে গেছেন ?

ডাঃ মিত্র : এক্ষুনি গেলেন। আসবেন মাঝে মাঝে। কোন চিন্তা করবেন না। ক'দিন পরেই তো আবার বাড়ি ফিরে যাবেন।

বীণা : কতদিন পরে ডাক্তার বাবু ?

ডাঃ মিত্র : এই ধরুন, মাস ছয়েকের মধ্যে।

বীণা : ছয় মাস ! সে তো অনেকদিন !

ডাঃ মিত্র : এ রোগের পক্ষে খুব অল্প সময়ই হবে। (শান্তাকে দেখিয়ে) জানেন, ইনি এক নাগাড়ে তিন বছর ছিলেন এখানে।

বীণা : (চোখ দুটো বড় করে) তিন বছর ! আমি ভাবতে পারিনে কী করে লোকে এখানে তিন বছর থাকে !

সুষমা : প্রথম-প্রথম আমারও তাই মনে হত ভাই। এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

ডাঃ মিত্র : আচ্ছা, আপনি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আলাপ পরিচয় করুন।

বীণা : ভালো হয়ে ফিরে গিয়ে ছেলেকে কোলে নিতে পারব তো ?

ডাঃ মিত্র : নিশ্চয়ই। কেন পারবেন না ? না পারলে

ভালো হওয়ার সার্থকতা রইল না। যেমনটি আগে ছিল ঠিক তেমনি ফিরে পাবেন সব। কিচ্ছু ভাববেন না।

শান্তা ঃ (বীণাকে বিদ্রূপের স্বরে) বাড়ির লোক কোলে নিতে দিলে তো নেবেন!

ডাঃ মিত্র ঃ (শান্তাকে উদ্দেশ্য করে ধমকের সুরে) আপনি চুপ করুন। বীণা দেবী আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। তাঁর প্রশ্নের জবাব আমি দেব, আপনি নন।

বীণা ঃ (কাতর ভাবে) ডাক্তর বাবু, আমি ভেবে পাইনে কী নিয়ে এখানে থাকব। আমার কোলের ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ডাঃ মিত্র : নিজের সন্তানের, স্বামীর এবং সমস্ত পরিবারের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে ক'টা দিন আপনাকে এখানে থাকতেই হবে। আপনাকে ভালো করে তোলা আমাদের দায়িত্ব। (একটু থেমে) খুব কড়াকড়ি কিছু নেই। তবে ডাক্তাররা যা বলবেন সে নির্দেশ মেনে চলতে হবে অবশ্যই। সময় কাটানোর জন্যে কাছেই লাইব্রেরী রয়েছে। প্রচুর বই

পড়তে পারবেন। তাছাড়া হাতের কাজ করার সুযোগও আছে প্রচুর।

বীণা ঃ আচ্ছা কেউ কেউ বলেন, এ রোগ সারানো নাকি শিবেরও অসাধ্য!

ডাঃ মিত্র ঃ (হেসে) রুগী যদি ধরা না দেয়, তাহলে নেপথ্যে থেকে স্বয়ং শিবও রোগ সারাতে পারবেন না। তবে এ রোগ সারে না, এ কথা আমরা স্বীকার করতে রাজী নই। বহু রুগী এখান থেকেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। (একটু থেমে) আপনি ব্যস্ত হবেন না। ধীরে ধীরে আপনারও সেই ভুল ধারণা কেটে যাবে। এ রোগ সম্বন্ধে কিছু বই ও ম্যাগাজিন রয়েছে ঐ 'মিলনী' গ্রন্থাগারে। পড়বেন মাঝে মাঝে। শতকরা পঁচিশটির বেশি রোগ সংক্রামক নয়। আর প্রথম অবস্থাতে ধরা পড়লে রোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে সারে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে অনেকে সমাজের ভয়ে আত্মগোপন করে, তাই সারতে দেরী হয়। আপনি লেখাপড়া জানেন, এ বিষয়ে আপনার জানতে বুঝতে

বেশী সময় লাগবে না। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) বিশেষ কাজ আছে, এখন আসি।

[প্রস্থান]

সুষমা : এখন একটু আলাপ পরিচয় করা যাক্।

শান্তা : ডাঃ মিত্রের সামনে কিছু বলার উপায় নেই। যাকগে বাঁচা গেল।

সুষমা : (বীণাকে) কী নাম ভাই আপনার ?

বীণা : বীণা সেন।

শান্তা : কী সুন্দর আপনার চেহারা! কিন্তু দেখছি নিষ্ঠুর ভগবান আপনাকেও রেহাই দিলেন না।

বীণা : (ম্লান হাসি হেসে) সৌন্দর্য! সে তো মাংস-চামড়া-রং-এর প্রশংসা। এর কী দাম আছে ? পুড়ে ছাই হয়ে যাবে একদিন।

শান্তা : কিন্তু এই দেখেই তো ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন আপনার শাশুড়ী।

বীণা : অস্বীকারের উপায় নেই ভাই।

(সুষমা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করল শান্তাকে প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য]

সুষমা : বাড়িতে কে কে আছেন ?

বীণা : স্বামী, একটি বছর দেড়েকের শিশু আর বিধবা

শাশুড়ী। বেশ শান্তিতেই ছিলাম ভাই, কিন্তু কী যে হয়ে গেল !

সুষমা : কিচ্ছু হয়নি। ডাঃ মিত্র তো বললেন, আপনি শীগ্‌গীরই ভালো হয়ে ফিরে যাবেন।

শান্তা : (উগ্র ভাবে) ডাক্তারদের কী। তারা বলেই খালাস। কিন্তু ভুগতে হয় আমাদের। আমাকেও তো এ'রকম বলেছিলেন। কিন্তু কী হল ?

বীণা : আপনি ক'দিন আছেন এখানে ?

শান্তা : ক'দিন কী! ক'বছর বলুন। আজ চার বছর আছি। ভালো হয়ে গিয়েওছিলাম। কিন্তু কেউ ঠাঁই দিলে না। কুকুর বেড়ালের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

বীণা : স্বামী ?

শান্তা : তিনি তাঁর মা'র বাধ্য সন্তান! তাঁর কথায় বিয়ে করেছিলেন, আবার তাঁরই কথায় তাড়িয়ে দিয়ে আবার বিয়ে করলেন। মা'র আদর্শ সন্তান।

বীণা : (চোখ দুটো-কপালে তুলে) বলেন কী ?

সুষমা : (শান্তাকে উদ্দেশ্য করে) বড্ড বাজে বকিস শান্তা। চুপ কর। কখন কী বলতে হয় কিছুই জানিস নে! শুধু আজে-বাজে কথা।

বীণা : বলুক ভাই। আমার সব জেনে রাখা ভালো। (একটু ভেবে নিয়ে) আমার স্বামী ও শাশুড়ী অবশ্য ও'রকম নয়।

শান্তা : এ গর্ব আমারও এক কালে ছিল। হাসপাতালে আসবার সময় মনে মনে শত সহস্র বার বলেছিলাম, এমন স্বামী যেন জন্মে জন্মে পাই। কিন্তু এবার আসবার সময় বলে এসেছি, এমন ভীরু কাপুরুষের মুখ যেন আর দর্শন করতে না হয়।

সুষমা : হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না শান্তা। মন্দ যেমন আছে, ভালো বিবেচক লোকও আছে সংসারে।

বীণা : [শান্তাকে] হাসপাতালের সার্টিফিকেট দেখিয়েছিলেন কি?

শান্তা : তা' আর দেখাই নি! একবার সসংকোচে দেখে নিয়ে পতি দেবতা বললেন, তা ভালোই ম্যানেজ করেছ। তারপরে সেই বাদামী রং-র কাগজটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে মন্তব্য করলেন, যত সব বুজরুকি। মিনতি জানালাম, আমার কথা শোনো। তিনি উত্তরে

বললেন, আমার অত সময় নেই। হন হন করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বীণা : (সশঙ্কিত ভাবে) কি সর্বনাশ! কী ভয়ঙ্কর লোক আপনার স্বামী!

শান্তা : সব স্বামীই এ ক্ষেত্রে সমান।

বীণা : না, না, একথা বলবেন না ভাই। আমার ভয় করছে। বুকের ভিতরটা কী রকম করে উঠছে। আমার স্বামী আমার ছেলে, আমার শাশুড়ী, সংসার……(আর বলতে পারল না বীণা)

সুষমা : আপনি এসব ভাববেন না। ওর একটু বাড়িয়ে বলার বাতিক আছে। ও সব বানানো কথা।

[সরোষে শান্তাকে]

জান শান্তা, ডাঃ পাল, তোমাকে এবিষয়ে বহুবার সাবধান করে দিয়েছেন। তবুও তোমার চৈতন্য হয় না। শেষ পর্যন্ত তোমার এখানেও ঠাঁই হবে না দেখছি। বিদেয় হতেই হবে।

শান্তা : (ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে) আমি সবাইকে সাবধান করে দেবো। আমার মত কেউ যেন না ঠকে। পুরুষদের বিশ্বাস না করে।

সুষমা : (বীণাকে সান্ত্বনার স্বরে) আপনি কিছু মনে করবেন না ভাই। ওর মাথার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে এসেই একেবারে বদলে গেছে। আবল তাবল বকছে।

বীণা : না, না, আমি কিছু মনে করিনি। উনি তো আমার ভালোর জন্যেই বলছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মাথাটা যেন কী রকম করে উঠল।

সুষমা : (শান্তাকে) এ সব কথা এখন থাক শান্তা, সময় অসময় জ্ঞান নেই তোর। তাছাড়া অপ্রিয় সত্য সব সময় সব জায়গায় বলতে নেই।

শান্তা : (রাগত ভাবে) ধমকে মুখ বন্ধ করা যায় কিন্তু সত্যকে ঢাকা যায় না সুষমাদি। প্রয়োজন মনে করলে পথে পথে চেঁচিয়ে বলে বেড়াব স্বামীদের দুর্ব্যবহারের কথা। কে আমার মুখ বেঁধে রাখবে শুনি ?

সুষমা : (বিরক্ত হয়ে) বদ্ধ পাগলী !

শান্তা : আমি পাগলী ! তুমি গুমরে মর, আমি তা পারিনে। প্রকাশ্যে বলি বলে আমার মাথা খারাপ। কেন, তুমি বলনি, তুমি দুঃখ

করনি, তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে তোমার প্রিয়তম তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে এ রোগের ভয়ে ?

সুষমা : (শাসনের ভঙ্গিতে) বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু।

শান্তা : আমাকে খোঁচালে কেন ?

[গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল শান্তা]

সুষমা : (বীণাকে) আপনি বিশ্রাম করুন ভাই।

বীণা : (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) বিশ্রাম! সংসারে থাকার সময় মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত বিশ্রাম নিতে। কিন্তু ভগবান এখন অফুরন্ত বিশ্রামের অবসর করে দিলেন। এ বিশ্রাম কবে শেষ হবে তাই ভাবছি।

সুষমা : অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন ভাই ? রোগ যখন শুরুতেই ধরা পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই। কয়েক মাসের মধ্যেই সেরে যাবে। তারপর ফিরে গিয়ে সব পাবেন।

(একটু থেমে) আচ্ছা ভাই, আপনার স্বামী কী করেন ?

বীণা : শিক্ষক। খুব নিরীহ গোবেচারা! নিজে চেয়ে খেতে জানে না ভাই। তা'র যে কত কষ্ট হচ্ছে কে

জানে। তার উপর কচি ছেলেটা। ভাবলে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। আচ্ছা ভাই, খোকনকে কি উনি এখানে নিয়ে আসতে পারেন না? শুধু একদিনের জন্য একবারটি দেখব।

সুষমা : ডাক্তারবাবু কখনও রাজী হবেন না। তা' ছাড়া নিয়মও নেই। কারণ শিশুদের পক্ষে এ বিপদ্‌-জনক।

বীণা : (অসহায় ভাবে) আমার সব দিক গেল।

সুষমা : এত হতাশ হবেন না ভাই। আপনার স্বামী বিবেচক, শিক্ষিত বুদ্ধিমান, সহৃদয়। কাজেই ফিরে গেলে আপনাকে অবহেলা করবেন না।

বীণা : তা' হয়তো করবেন না। কিন্তু শান্তাদি' যে বললে...

সুষমা : ওর কথা ছেড়ে দিন। ও ভাবের ঘোরে চলে। কখন কী বলে, মাথা মুণ্ডু, কিচ্ছু ঠিক নেই। দেখলেন না, কেমন পাগলী পাগলী ভাব। শিক্ষক স্বামী আপনার। কাজেই অমানুষের মত কিছু করবেন বলে মনে হয় না। নিজে মাষ্টারী করেছি জানি; পরিবেশের একটা প্রভাব আছে বৈ কি!

অবশ্য মানুষের ইচ্ছামতই সব সময় সব কাজ হয় না।

বীণা ঃ কেন এমন হয় বলতে পারেন দিদি ?

সুষমা ঃ কেন'র উত্তর দেবার মত বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই বোন। তবে মনে হয় মানুষ যদি তার ইচ্ছেমত সবই করতে সক্ষম হয়, তাহলে বোধ হয় ভগবানের উপর আস্থা কমে আসে। অহং ভাবটা বেড়ে যায়।

বীণা ঃ (একটু ভেবে) আপনার কথাই ঠিক। নইলে যা চেয়েছিলুম তাই পেয়েছি—শিক্ষিত, সুন্দর, সুপুরুষ স্বামী ; ফুলের মত সুন্দর পুত্র, ছোট্ট সংসার। কিন্তু হঠাৎ চাকা উল্টে গেল। সব সাধ আকাঙ্ক্ষা কর্পূরের মত উবে গেল।

সুষমা ঃ আপনার স্বামী স্কুলে কোন্ বিষয় পড়ান ?

বীণা ঃ ইংরেজী, বাংলা দুই-ই। এ' দুবিষয়ে এম. এ.।

সুষমা ঃ ডবল এম, এ। কোন্ ইয়ারে পাশ করেছেন ? নাম জানতে পারি কি ? অবশ্য আপত্তি থাকলে থাক।

বীণা ঃ তাঁর নামেই তো আমার পরিচয়। কাজেই আপত্তি থাকার কারণ নেই। রমেন সেন।

সুষমা ঃ (একটু ভেবে নিয়ে) রমেন সেন। দোহারা চেহারা, মাথার চুলগুলো একটু কোঁকড়ান, একটু লাজুক ভাব। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। বছর পাঁচেক আগে এমনি একজন রমেন সেন আমার সহপাঠী ছিলেন।

বীণা ঃ (মনে মনে হিসেব করে) বাংলার ক্লাশে। ঠিক বলেছেন। (সুষমার ভাবান্তর ঘটল) কি ভাবছেন ?

সুষমা ঃ না, কিছু নয়।

বীণা ঃ হঠাৎ এমন হয়ে গেলেন কেন ?

সুষমা ঃ (সামলে নিয়ে) অদ্ভূত ভাল ছাত্র। মনে হচ্ছে ইনিই তিনি। তাই যদি হয়ে থাকে তবে সত্যিই আপনি ভাগ্যবতী।

বীণা ঃ (উৎসাহে) আপনি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বলুন না, তার কথা, শুনতে ইচ্ছে করে।

সুষমা ঃ আর একদিন বলব ভাই।

বীণা ঃ আজ আপনাকে অনেক বকালাম। মনে কিছু করবেন না।

সুষমা ঃ না না, মনে করব কেন। জীবনের বেশির ভাগ সময়টা বকে বকে কেটেছে, অসুখ হওয়ার আগ পর্যন্ত। মাষ্টারী জীবনে বকার শেষ নেই।

বীণা ঃ উনিও ঠিক তাই বলেন। (একটু থেমে) কম কথার মানুষকে বেশী বকতে হ'লে কষ্ট হয় বৈকি !

(ঝড়ের বেগে শান্তার পুনঃ প্রবেশ)

শান্তা ঃ (সুষমাকে) তাড়িয়ে দিলে, তবুও আসতে হ'ল। একটা জরুরী খবর দেবার জন্য। ভেবেছিলাম আসবই না, কিন্তু…

সুষমা ঃ (বাধা দিয়ে) তোর খবর তোর কাছেই তোলা থাক। আর জ্বালাস্ নে। আমি শুনতে চাইনে। (দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে) এখন যা।

শান্তা ঃ শুনলে কিন্তু আঁতকে উঠবে। আপিসে শুনে এলাম, কমলাদি, সেই দশ নম্বর ঘরে থাকতেন, তোমার সঙ্গে গলাগলি ভাব ছিল, সে গলায় দড়ি দিয়ে…

সুষমা ঃ (ধমক দিল) চুপ কর্।

শান্তা ঃ বিশ্বাস হচ্ছে না ! তবে যাই শম্ভুকে ডেকে আনি। সে-ও শুনেছে।

সুষমা ঃ (রাগত ভাবে) বেরো, বেরো, আমার সুমুখ থেকে।

(ত্রস্তে শান্তার প্রস্থান)

(স্বগতঃ) কমলাও গেল ! তার মত মেয়ে…

বীণা ঃ (সন্ত্রস্ত হয়ে) কথাটা তা'হলে সত্যি ? কেন আত্মহত্যা করলেন কমলাদি, কি হয়েছিল তাঁর ? ক'দিন ছিলেন এখানে ?

সুষমা ঃ (একটা গভীর দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে) খুব ভাল মেয়ে। বছরটাক এখানে ছিল। বড়লোকের সুন্দরী স্ত্রী গাড়ী, বাড়ী, কোন-কিছুরই অভাব ছিল না। তবুও...

বীণা ঃ মনে যদি শান্তি না থাকে, গাড়ী বাড়ী দিয়ে কী হবে ?

সুষমা ঃ যাক্। যে গেছে তাঁর কথা ভেবে লাভ নেই। তবে আত্মহত্যা মহাপাপ। মনুষ্যজীবন দুর্লভ, এভাবে শেষ করা মহাপাপ।

বীণা ঃ (হতাশার কণ্ঠে) আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়; কিন্তু কচি ছেলেটার চেহারা মনে হ'লেই হাত পা যেন অসাড় হয়ে পড়ে।

সুষমা ঃ এসব আজে বাজে চিন্তা করবেন না। জীবনে বিপদের সঙ্গে যুঝার সার্থকতা আছে একটুতেই ভেঙে পড়া ঠিক নয়।

(দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল)

ওঃ! দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

অথচ চান-টান কিছু হয়নি। আপনাকেও সেই থেকে ধরে রেখেছি। খাবার ঘণ্টা পড়েছে।

বীণা ঃ আমার ক্ষিধে-টিধে সব উবে গেছে। আপনি যান খেয়ে আসুন।

সুষমা ঃ আমরা এরকম দুঃসংবাদ প্রায়ই শুনি; অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। আপনি প্রথম শুনেছেন তাই আঘাতটা জোর লেগেছে। তাছাড়া শান্তার কথা বিশ্বাস করাও কঠিন। অনেক সময় বানিয়ে বলে সে।

বীণা ঃ মৃত্যুসংবাদ কি কেউ কখনও বানিয়ে বলে ?

সুষমা ঃ যাদের বলাই স্বভাব, তারা সব সময়েই বলে ভাই। যাক, এসব কথা এখন থাক। উঠুন, চান না করেন তো, মাথাটা ধুয়ে নিন।

বীণা ঃ আপনি যান। আমার কেবলই একটা প্রশ্ন জাগছে মনে—কেন, কেন আত্মহত্যা করলেন কমলাদি' ?

সুষমা ঃ হয়তো সে স্বামীর ব্যবহারে আঘাত পেয়েছে।

বীণা ঃ বোধ হয় তাই হবে। আর দশজন দশ কথা বললে সহ্য হয়, কিন্তু স্বামী যদি কটূক্তি

করে, তবে মনে বেশী লাগে। বুকখানা ভেঙে যায়।

সুষমা ঃ আপনি কেন ওসব বাজে কথা ভাবছেন বলুন তো? আপনার স্বামী রমেনকে ভাল করেই জানি, সে কখনও আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন।

বীণা ঃ উনি প্রায়ই বলেন, মানুষ অবস্থার দাস।

সুষমা ঃ আমরাও অবস্থার দাস। এখানে যখন এসেছি, তখন এখানকার নিয়ম মেনে চলতে হবে বৈ কি! উঠুন, চলুন। (বীণার একটা হাত ধরে ওঠাল সুষমা)

(পর্দা নামল)

তৃতীয় দৃশ্য

[হাসপাতাল, পুরুষ বিভাগ। সময় বিকাল।
হলঘরে বসে রুগীদেব মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।]

রতন : দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল। জীবনের মূল্যবান সময়টা কেটে গেল বাঁকুড়ার এই প্রান্তরে। জানিনে কবে ফিরে যাবো বাড়ী।

বীরু : রতনদা! আপনি ফিরে গেলে স্কুলের কাজটা আবার পাবেন তো?

রতন : সেটা স্কুল-কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর নির্ভর করে। খুব সম্ভবতঃ রাজী হবেন না। আমাদের সমাজের ছেলেরাই তো ঐ স্কুলে পড়ে। অভিভাবকেরা নিশ্চয়ই আপত্তি তুলবেন।

বীরু : তবে যে ডাক্তারবাবু বলেন, ভাল হয়ে ফিরে গিয়ে আমরা যার যার কাজ ফিরে পাবো—যেমন যক্ষ্মা রোগীদের বেলায় হয়। তারা সেরে উঠলে সমাজে, চাকরিতে, সব জায়গায় ঠাঁই পায়, আমরা কেন পাবোনা?

রতন : কুষ্ঠরোগের ভীতি ভয়ংকর ভীতি। লোকের ধারণা, এ রোগ সারানো স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য।

তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না, এ রোগ সারে বা ছোঁয়াচে নয়।

বীরু ঃ তাহলে, আমরা সেরে উঠে ভাল হয়ে কী করবো ? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো ? কী ভাবে জীবিকা-নির্বাহ করবো ?

রতন ঃ সেই তো আমাদের সমস্যা বীরু—বড় বড় মহারথীরা কৃপা ক'রে কখনও কখনও আসেন আমাদের দুরবস্থা দেখতে। সহানুভূতি দেখান, আশ্বাস দেন, রঙীন ছবি তুলে ধরেন। জীবনে কিন্তু কাজ কিছুই হয় না, বধির সমাজ কারো কথা শুনতে পায় না, শুনতে চায় না। আবহমান কাল থেকে কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

বিশ্বনাথ ঃ সেদিন তো সাহিত্যিকরাও এসেছিলেন। তাঁরা তাঁদের লেখনীর সাহায্যে গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজকে তো বোঝাতে পারেন! আমাদের অসহায় জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আমরা তো সমাজের বাইরে নই—তাঁদেরই ভাই।

রতন ঃ (ব্যঙ্গের সুরে) তাঁদের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে

আমরা পঙ্গু হাতে যথাসাধ্য হাততালি দিয়েছি, প্রশংসা করেছি। গান করে, কবিতা পাঠ করে, রচনা পড়ে শুনিয়েছি। তাঁরা খুশি হয়েছেন। এর বেশি আর কী চাও ভাই ?

সমীর ঃ হ্যালডন সাহেবও এসেছিলেন। আশা-ভরসা দিয়ে গিয়েছেন।

রতন ঃ তিনি মিথ্যা আশ্বাস দেননি। তাঁদের দেশ থেকে এ জঘন্য রোগ নির্মূল হয়েছে। কাজেই আমাদের দেশ থেকেও এ রোগ একদিন বিদেয় হবে এ আশা করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

জিতেন ঃ আমি ভাবছি ফিরে গিয়ে জোর আন্দোলন করবো। মিছিল বার করবো। সংসারজীবনে পুনর্বাসনের জন্যে দাবী জানাবো।

রতন ঃ (হেসে) এ অনেকটা ভুখামিছিলের মতই হবে। কৃপাদৃষ্টি দিলেও কেউ সে মিছিলে যোগ দেবে না। দূরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবে। সহানুভূতি দেখাবে।

[ডাঃ শিশির মিত্রের প্রবেশ]

ডাঃ মিত্র ঃ তোমরা কী সব বিষয় নিয়ে আজ আলাপ করছ ?

বীরু ঃ আজ্ঞে আমাদের আলোচ্য বিষয় সেই এক। ভাল হয়ে ফিরে গিয়ে সমাজে ঠাঁই পাবো কিনা! যদি আগের মত মিলে মিশে একত্র থাকার সুযোগ না থাকে, তাহলে ফিরে গিয়ে কী হবে?

ডাঃ মিত্র ঃ অতটা নিরাশ হবার কারণ নেই। সমাজের চৈতন্য ফিরে আসছে। সরকারও এ বিষয় চিন্তা করছে। তবে একটু সময় লাগবে। কুপ্রথা, কুসংস্কারকে দূর করতে সময় লাগে বৈকি! এক সতীদাহ প্রথা বিলোপ করতে কত যুগ লেগে গেল। যক্ষ্মা রোগীদের বেলাতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ রোগ সম্বন্ধে সমাজ-ভীতি ভয়ংকর।

জিতেন ঃ যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি, সেদিন থেকেই শুনে আসছি, আর ভয় নেই!

ডাঃ মিত্র ঃ কুসংস্কার জগদ্দল পাথরের মত হাজার হাজার বছর ধরে সমাজের বুকে চেপে বসে আছে। তবে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। তোমরাও এ ক'বছরে এ রোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু

জেনেছ, পড়েছ। (একটু থেমে) তোমরা শীগ্‌গিরই আলোর মুখ দেখতে পাবে। সরকার ও জনসাধারণ ভাবছে এ বিষয়ে। 'আফটার কেয়ার কলোনী' তৈরি হচ্ছে; শিল্প, কলাবিদ্যা ইত্যাদির সুযোগ তোমাদের হাতে প্রচুর আসবে। সম্প্রতি ভারতের সুযোগ্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বৃহত্তর সমাজে তোমাদের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে বলেছেন সমাজকে।

বীরু ঃ কিন্তু স্যার, কা-কস্য পরিবেদনা। মানুষ বক্তৃতা শুনছে আর ভুলছে। আবার নতুন ধরণের বক্তৃতা শোনবার জন্যে ছুটছে। বক্তৃতা করা আর শোনার নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। আসল কথা, আমরা এখনও সাত হাত জলের নীচে পড়ে আছি।

ডাঃ মিত্র ঃ (হেসে) কত হাত জলের নিচে আছি ঠিক বলতে পারছিনে। তবে আমার মনে হয় ডুবজলে আর পড়ে নেই। পায়ের নিচে মাটির নাগাল পেয়েছি।

জিতেন ঃ রুগীর কথা কে শুনবে? কোন কোন হাসপাতালের ডাক্তাররা পর্যন্ত আমাদের দেখে ভয় পায়। দু' পা পিছিয়ে যান কাছে গেলে। কাজেই সাধারণ লোকের দোষ দিলে কি হবে?

ডাঃ মিত্রঃ কাথাটা খুবই সত্যি। কোন কোন ডাক্তার এ রকম আচরণ করেন বটে। তাঁরা বিষয়টাকে হয়তো তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন না। নিজেদের চিকিৎসা বিভাগ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তা' ছাড়া তাঁরাও কুসংস্কার থেকে মুক্ত নন। কুসংস্কার পৃথিবীর বহু উচ্চশিক্ষিত সমাজে এখনও বাসা বেঁধে আছে। তবে রোগ সম্বন্ধে এতটা বাড়াবাড়ি আর পশ্চিম দেশে নেই।

বীরু ঃ জানেন স্যার্! সৌমেনদার স্ত্রী-পুত্র সৌমেনদাকে ঘরে ঠাঁই দেয়নি। মনের দুঃখে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন।

ডাঃ মিত্র ঃ ঐ ষ্টীগমা! কুসংস্কার। সৌমেনের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় তারা সবাই আমাদের সমাজেরই প্রাণী। কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ রকম ঘটনা আমাদের প্রায়ই কানে আসে। বিশেষ করে মেয়েদের বিভাগ থেকে। আত্মহত্যা

করা সমীচীন নয়। জীবন-যুদ্ধে অত সহজে হার স্বীকার করলে চলবে না।

[সুশোভন এতক্ষণ মন দিয়ে ডাক্তার মিত্রের কথা শুনছিল]

সুশোভনঃ আমি কবে ভালো হবো? এদিকে যে পরীক্ষার সময় এসে গেছে।

ডাঃ মিত্রঃ আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর বাবা! কোর্সটা শেষ হোক।

সুশোভনঃ আমার আর ইনজেক্শন নিতে ভাল লাগে না। কতদিন ধরে নিচ্চি।

ডাঃ মিত্রঃ যতদিন প্রয়োজন দিতে হবে বৈ কি!

সুশোভনঃ বন্ধুবান্ধব সব পাশ করে বেরিয়ে যাবে আর আমি এই হাসপাতালে থেকে শুধু ওষুধ আর ইনজেক্শন নিতে থাকবো। আমি কী করে নীচের ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে আবার পড়বো!

ডাঃ মিত্রঃ সবই বুঝছি বাবা। তুমিই বল, অসুখের উপর কি জুলুম করা চলে? একটু ধৈর্য ধরতে হবে বৈকি। ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা মানুষের পরম সম্পদ।

সুশোভন ঃ আসল কথার কিছু নেই। শুধু ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর। ও ছাই চিকিৎসা আমি করাবো না।

ডাঃ মিত্র ঃ তুমি তো পড়াশোনায় ভাল। তোমার ভাবনা কি? ভাল হয়ে ফিরে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করো। পরীক্ষায় ভাল ফল করে নিশ্চয়ই উন্নতি করবে। শুনে আমাদের কত আনন্দ হবে বল তো!

সুশোভন ঃ জানেন স্যার, বাবা বলেছেন আমাকে ব্যারিষ্টারি পড়াবেন। আমার ব্যারিষ্টার হ'তে খুব ইচ্ছা করে। আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত হবো।

ডাঃ মিত্র ঃ বেশ বেশ। সব সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। ভাল কথা, একটা রচনা প্রতিযোগিতার জন্যে একজন বাইরের ডাক্তার দুটো পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। রচনার বিষয়বস্তু হল 'কুষ্ঠ রোগীর আত্মকথা'। পনর পৃষ্ঠার বেশী হবে না।

রতন ঃ আমাদের আত্মকথার পক্ষে পনর পৃষ্ঠা কিছুই নয়। লিখতে গেলে বোধ হয় রামায়ণ মহাভারতের মত মোটা বই হবে।

সুশোভন : স্যার, আমি লিখবো।

ডাঃ মিত্র : সবাই যোগ দিতে পারবে! তোমাদের জন্যেই এই রচনা ঠিক করেছেন পুরস্কারদাতা। মেয়েদের বিভাগও যোগ দেবে।

বীরু : ওরা তো স্যার কেঁদে ককিয়ে ছেলেপুলের দুঃখ জানিয়ে লিখবে। পুরস্কার নির্ঘাত ওরাই পাবে।

ডাঃ মিত্র : ছিঃ একথা বল্‌তে নেই। মেয়েরা এখন যথার্থই সব বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্চে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। অযথা তাদের হেয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রত্যেকে যার যার নিজস্ব যোগ্যতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু অপরের সমালোচনা করবে না। এতে নিজেকে ছোট করা হয়।

সুশোভন : ডাঃ বোস বলেছেন রুগীদের রাজনীতির ব্যাপারে থাকা উচিত নয়।

ডাঃ মিত্র : ঠিক। রুগীদের প্রধান কর্তব্য রোগ যাতে সারে সেই ভাবে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলা।

প্রভাস : রুগীরা তবে কি নিয়ে থাকবে?

ডাঃ মিত্র : তোমরা ভবিষ্যৎ জীবন কী ভাবে কাটাবে সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। পরিকল্পনা করা

উচিত। আজে বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামান উচিত নয়।

প্রভাস ঃ অতীত আমরা ভুলতে বসেছি, বর্তমান আমাদের দুর্বিসহ, আর ভবিষ্যৎ অচিন্তনীয়।

ডাঃ মিত্র ঃ অতটা নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই উন্নতি হবে। তা' ছাড়া চিকৎসা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে (একটু থেমে) আচ্ছা ? আজ এই পর্যন্ত থাক।

[প্রস্থান]

প্রভাস ঃ রতনদা, তুমি বড্ড কর্তৃপক্ষের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বল। বড়ই দুঃখের কথা।

রতন ঃ আমাদের উচিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করা। নইলে আমাদের রোগ সারবে কি করে!

প্রভাস ঃ এই ধরনের ঔচিত্য বোধ দুর্বলতার লক্ষণ। এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে।

সুশোভন ঃ প্রভাসদার বক্তৃতা শুরু হলো। সাবধান।

[প্রভাস কটমট করে তাকাল সুশোভনের দিকে]

প্রভাস ঃ দেশের ও দশের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে হলে বক্তৃতার প্রয়োজন আছে। দাবী জানাতে হলে বক্তৃতার প্রয়োজন আছে। তবে কাপুরুষদের ওসব প্রয়োজন নেই। না, সন্ধ্যেটা মাটি হয়ে গেল। বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে লাভ নেই।

[প্রস্থান]

রতন ঃ বদ্ধ পাগল! রাজনীতির ঝোঁক এখনও কাটেনি হাসপাতালে ঢুকেও বক্তৃতা উচ্ছ্বাস।

সুশোভন ঃ প্রভাসদা একদিন বললেন, জানিস সুশোভন, এই হাত চিরদিন এমন ছিল না। এই হাত দিয়ে একদিন দেশের শত্রুদের বোমা মেরেছি। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

রতন : ও সব লোক ভাবাবেগে চলে।

সুশোভন ঃ প্রভাসদার কথাগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগে কিন্তু।

রতন : তা লাগবে বৈ কি! নইলে লোকের আকর্ষণ বাড়বে কি করে!

[হঠাৎ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে]

সাতটা বেজে গেল দেখছি। এখন আড্ডা ভাঙ্গা যাক্।

[সকলেই গাত্রোত্থান করল। (পর্দা নামল)

[চতুর্থ দৃশ্য]

স্থান কোলকাতা, সময় সকাল

[ডাঃ সমর রায় তার চেম্বারে বসে একজন রোগীর অপেক্ষায়। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। এমন সময় একজন যুবতীর প্রবেশ]

সমর : এই যে! ওঃ আপনি!

[বিস্ময়ের দৃষ্টিতে]

মনীষা : আমাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছেন!

সমর : তা' একটু হয়েছি বৈ কি। এক ভদ্রলোকের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এনগেজমেণ্ট ছিল। নইলে রোববার চেম্বারে বসিনে। এ কি! দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

[সুমুখের সোফাটায় বসে পড়ল মনীষা]

মনীষা : আমি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে এসেছি।

সমর : নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। প্রথমে আমি আপনার দাদার বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার।

মনীষা : আমি কিন্তু রোগী হিসেবে আসিনি।

[সমর ভ্রূ কুঁচকে]

সমর : , কনফিডেনসিয়াল নাকি?

মনীষা : ঠিক তাই।

সমর ঃ দাঁড়ান, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি। কেউ হয়ত ঢুকে পড়বে।

[উঠে দোরটা বন্ধ করে]

বলুন, আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারি !

মনীষা ঃ আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানলাম, আপনি নাকি আমাকে দয়া করে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন।

সমর ঃ ঠিকই শুনেছেন। তবে দয়া করে নয়, স্বেচ্ছায়।

মনীষা ঃ স্বেচ্ছায় ?

[অবিশ্বাস্যের দৃষ্টিতে মনীষা তাকাল সমরের মুখের দিকে]

সমর ঃ কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

মনীষা ঃ না। কোন কুষ্ঠ রোগ মুক্ত মেয়েকে কোন সুস্থ পুরুষের বিনা মতলবে স্বেচ্ছায় বিয়ে করার কথা আমি বিশ্বাস করিনে।

সমর ঃ মনে করুন, আমার কোন মতলব বা স্বার্থ আছে !

মনীষা ঃ আপনি হয়ত ভেবেছেন, সহানুভূতি, উদারতার পরিচয় দিয়ে বন্ধুদের কাছে, সমাজের কাছে বাহবা নেবেন। তাই না ?

সমর : যাক্, বাঁচা গেল, শুধু বাহবা। আর কিছু নয় তো ?

মনীষা ঃ ডাক্তারদের মতলব বোঝা শক্ত। হয়ত নার্সিং হোম খোলবার মতলব এঁটেছেন। দাদার কাছে শুনেছেন আমি সম্প্রতি মিডওয়াইফারি পাশ করেছি।

সমর ঃ [চেঁচিয়ে]

ওয়াণ্ডারফুল ! এ সাজেসনটা সত্যিই চমৎকার। আমার মাথায় কিন্তু এতদিন আসে নি। সুখেনটা আপনার সম্বন্ধে এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। আমি আপনার কল্পনা শক্তির প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে।

মনীষা ঃ আমার সম্বন্ধে আপনাকে ভাববার অধিকার কে দিল ?

সমর ঃ অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে করে নিতে হয় বৈকি !

মনীষা ঃ গায়ের জোরে ?

সমর ঃ না, মনের জোরে, হৃদয়ের জোরে।

মনীষা ঃ [রাগত ভাবে]

আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

সমর ঃ আমার মনে হয় আমরা দু' জনই সমান সমান যাচ্ছি।

মনীষা : যাক্ আসল কথাটা বলছি। আপনি আমাকে অযথা অনুগ্রহ দেখিয়ে মনঃকষ্ট দেবেন না। এ অনুগ্রহ আমি সহ্য করতে পারব না। কিছুতেই না। বুঝলেন ?

সমর : আমি বুঝে ওঠতে পারছিনে আপনি অনুগ্রহ, দয়া, এ' সব কথা বলছেন কেন! আপনিইত বলেছেন আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাবের মধ্যে একটা স্বার্থ রয়েছে।

মনীষা : দেখুন, এ' সব হেঁয়ালি আমার ভাল লাগে না। আমি সিরিয়াসলি বলছি। এবং আপনার ভালর জন্যে, মঙ্গলের জন্যে। এ বদখেয়াল আপনি ত্যাগ করুন। নিজেকে আমার সঙ্গে জড়াবেন না। তা' ছাড়া আমি যে অবহেলিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, দুঃখময় জীবন ফেলে এসেচি, সেই পংকিলে আর কাউকে টানতে চাই নে।

সমর : আপনি এখন সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত। কাজেই আপনার ভয়টা নিতান্ত মিথ্যে ও কাল্পনিক।

মনীষা : আমার রোগ সারার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভীতি, সংস্কার দূর হয়ে যায়নি। কাজেই আপনার আত্মীয় স্বজন আপনাকে, আমাকে, কাউকে

ক্ষমা করবে না। আপনাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। এভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। প্লিজ।

সমর : (হেসে) আপনার কথাটাই আমাকে ব্যবহার করতে হল। আমার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অত ভাববার অধিকার কে দিল আপনাকে ?

মনীষা : সত্যি, আপনি বেহায়া বটে।

সমর : ডাক্তারদের বেহায়া না হয়ে উপায় নেই। রুগীদের কাছে অনেক রকম রূঢ় কথা শুনেও আবার যেতে হয়। একটা নৈতিক দায়িত্বের তাগিদে।

মনীষা : আমি তো আর আপনার রুগী নই।

সমর : আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যথার্থই একজন রুগী। রোগটা দেখছি 'ইনফিরিয়রি'টি কমপ্লেক্স। এ সামান্য রোগ নয়।

মনীষা : থাক্ আমার ওপর আর ডাক্তারি বিদ্যেটা নাই ফলালেন। নিজের চরকায় তেল দিন।

সমর : (হেসে) জানেন তো এ বাজারে তেল দুষ্প্রাপ্য,

দুর্মূল্য। তাই অনেক চরকাই বিকল, অকর্মণ্য।

মনীষা : (ডান হাতের উপর নিজেব মাথাটা বেখে)

সত্যিই আপনাকে বোঝানো আমার কর্ম নয়। আপনি জেগে ঘুমোন দেখছি।

সমর : বোঝাতে যখন পারলেন না, তখন ওয়েলেসলীর নীতি গ্রহন করাই বোধ হয় ভাল।

মনীষা : মানে ? (সোজা হয়ে বসে হাতটা মাথা থেকে সরিয়ে নিয়ে)

সমর : অধীনতা মূলক মিত্রতা।

(মনীষা হাসল)

(হঠাৎ দরজায় কবাঘাত হল, সমব উঠে দাঁডাল)

(মনীষাকে) একটু ও ধারে রোগীর ঘরটায় গিয়ে বস। দেখি, কে এল।

[মনীষাব প্রস্থান]

(দরজা খুলেই সোৎসাহে চেঁচিয়ে) হ্যালো, সুখেন হঠাৎ কী মনে করে ? আয় বস্। (সুখেন চেম্বারে ঢুকে মুখোমুখি বসল)

সুখেন : বিরাট সমস্যায় পড়েছি ভাই। মনীষা বেঁকে বসেছে। বলছে, তুই নাকি অনুগ্রহ করে

তা'কে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিস। আসলে তা নয় তাকে কিছুতেই বুঝাতে পারছিনে। সে বলে অনুগ্রহ, অসহ্য। এমন জেদাল মেয়ে আর দু'টি দেখিনি! কী যে করি!

সমর: এক মুখে দু'রকম কথা ভাল নয় বন্ধু। এতদিন এক তরফা প্রশংসা শুনে শুনে আমার কান দুটো বায়াসড্‌ হয়ে ওঠেছে। এখন আর নিন্দে শুনতে রাজী নয়।

সুখেন: হেঁয়ালী ছাড়। এখন কী করি বল। দিন তারিখ সব ঠিক করার জন্য মা তাগিদ দিচ্ছেন।

সমর: একজন অধ্যাপক টধ্যাপক পাত্র খুঁজে বার কর। যে তোর বোনের মেজাজ বরদাস্ত করবে। তা' ছাড়া আমার মত ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলে বেচারা নার্সিং হোমে খেটে খেটে প্রাণান্ত হবে। জানিস তো আজকাল নার্সিং হোম খোলার রেওয়াজ হয়েছে!

সুখেন: ক্ষতি কী? এতে ডাক্তার ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হবে।

সমর: যা না। সাহস থাকে তো তোর বোনকে গিয়ে বল না।

সুখেন : কা'কে বলব! সেই যে সকালে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে কে জানে! হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ত'ার মেজাজটা খুব কড়া হয়ে গিয়েছে। কথাগুলো কাট কাট!

সমর : তাই হয়। ওখানে গেলে কড়া ধাতের লোক নরম হয় আর নরম ধাতের লোক কড়া হয়।

সুখেন : হেঁয়ালী রেখে স্পষ্ট বল কী করবি ?

সমর : যা' মেজাজের কথা বললি সাহস হচ্ছেনা।

সুখেন : আরে না, না, রাগের মাথায় একটু বাড়িয়ে বলে ফেলেছি। যাই দেখি গিয়ে ও ফিরল কিনা! তোর অনেক সময় নষ্ট করলুম। নিশ্চয়ই রোগীরা অপেক্ষা করছে।

সমর : রোগী একজন আছে বটে। তবে বড় বেয়াড়া ধরনের। মরফিয়া দিয়ে রেখেছি পাশের ঘরে।

সুখেন : ম-র-ফিয়া। বলিস কীরে ?

সমর : ওই এক ধরণের রোগী। যতক্ষণ জেগে থাকবে, ক্রমাগত জ্ঞান দিতে থাকবে। পড়ে থাক চুপ করে খানিকক্ষণ। একটু জিরিয়ে নিই।

সুখেন : যদি একটা কিছু ঘটে যায়!

সমর : ঘটলে আপদ চুকে যায়। রোগীর বক্তৃতা শুনতে আর ভাল লাগেনা। বিরক্তি ধরে গেছে।

সুখেন : আমি আসি। পরে আবার কথা হবে।

(প্রস্থান)

সমর : এস, [হাত উঁচিয়ে] টা, টা।

(পাশের ঘর থেকে মনীষার প্রবেশ)

মনীষা : উঃ, আপনি কী সাংঘাতিক লোক! খুব অভিনয় করতে পারেন দেখছি!

সমর : এ জীবনটা একটা মঞ্চ বৈত নয়। যে ভাল অভিনয় করতে পারবে সে হাততালি পাবে। এবং হাততালি পাবার লোভ আপনারও কম নয়।

মনীষা : আপনার দেখচি কথার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। খানিকক্ষণ আগে বললেন, তুমি আবার এক্ষুনি বললেন আপনি।

সমর : অতটা তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাবো আশা করতে পারিনি।

মনীষা : প্রমোশন দিতে হয় দুরন্ত ছাত্রদের, নইলে পথে ঘাটে ঢিল খাওয়ার ভয় থাকে।

(হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে)

বড্ড দেরী হয়ে গেল। ওদিকে হয়ত আমাকে না দেখে দাদার মাথা গরম হয়ে যাবে।

সমর : দাদা বলেন বোনের মাথা গরম, বোন বলেন দাদার। রায় দেওয়া শক্ত।

মনীষা : আর রায় দিয়ে কাজ নেই। হেকিম কখনও হাকিম হয় না।

সমর : মাথাটা একমাত্র আমিই ঠাণ্ডা করতে পারি। ভাই বোনের দুটোই ঠিক কিনা বল ?

মনীষা : (মুচকি হেসে) আসি। অনেক দেরী হয়ে গেল।

সমর এস। সেই নির্দিষ্ট তারিখে আবার দেখা হবে ছাঁদনাতলায়। মাথাটা যেন ঠাণ্ডা থাকে সেদিন।

মনীষা : (সলজ্জভাবে) দুষ্টু কোথাকার।

(সুখেনের পুনঃ প্রবেশ। সমরকে উদ্দেশ করে বলতে বলতে)

সুখেন : হ্যাঁ, ভাল কথা। মা'কে তাহলে বলব...
(সোফার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মণীষাকে দেখে অবাক হয়ে)
তুই, এখানে কখন এলি ? এইতো একটু আগেই আমি এখানে ছিলাম। কই দেখিনি তো !

মণীষা ঃ এ দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মাথাটা ধরেছে, তাই এলাম। একটা অষুধ খেয়ে নেব।

সুখেন ঃ কতদিন বারণ করেছি, রোদ্দুরে বেরুবিনা। রোদ তোর সহ্য হয় না। কিন্তু তুই কথা শুনবিনে।

সমর ঃ (সহাস্যে) দাদা বোনকে খুঁজতে বেরিয়েছে, বোনও দাদাকে খুঁজতে রদ্দূরে বেরিয়েছে।

সুখেন ঃ (সমরকে) টিকা টিপ্পনী না কেটে বরঞ্চ একটা বড়ি-ফড়ি দিয়ে দে, আর অষুধ না থাকে তো, একটা প্রেসক্রপসন লিখে দে।

মণীষা ঃ (আড় চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে) ডাক্তাররা ছিনো জোঁক। একটা রুগী হাতে পেলে সহজে ছাড়তে চায় না, রুগীর শেষ কপর্দক টুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

সমর ঃ অনেক রুগী আছে ডাক্তারকে সর্বস্ব দিয়েও তৃপ্তি পায়। মরে গেলে তা'র বাড়ীর লোকেরা গর্ব করে বলে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি। শেষ চেষ্টা করা হয়েছে।

মণীষা : এতে ডাক্তারেরই আখেরে লাভ হয়। গাড়ী-বাড়ীর পয়সা হয়।

সুখেন : সত্যিই বলেছে মনু। তোরা রোগীর উপর বাজেট করিস। মরে গেলেও বিনিপয়সায় ডেথ্ সার্টিফিকেট দিসনে। ভাবলে ঘৃণা হয়।

সমর : (হেসে) ব্যবসায়ীরা যদি পণ্যের উপর লাভ লোকসানের বাজেট করে তবে আমরা কেন রুগীর উপর বাজেট করব না!

সুখেন : (বিরক্ত হয়ে) বাজে বকিসনে। অষুধ দিবি তো দে!

মণীষা : (সুখেনকে তাগিদ দিয়ে) চ'ল দাদা। তোমার বন্ধুর কাছে অষুধ বোধ হয় নেই। পথে কোন ডিসপেনসারী থেকে কিনে নিলেই হবে।

সমর : তা' নিতে পারেন বটে। তবে বেশ খানিকটা রোদে হেঁটে যেতে হবে। অবশ্যই রোগটাকে পাকা করে কেউ কেউ অষুধ খায়।

মণীষা : কাঁচা ডাক্তাররা কিন্তু পাকা রোগ ধরতে পারে না। আশা করি তা জানেন।

সুখেন : (বিরক্ত হয়ে) আবার তুই ওর সঙ্গে বকছিস! মাথার যন্ত্রনা বেড়ে যাবে যে। চ'...

সমর : এক্ষুনি দিচ্ছি। (ভেতরে গিয়ে একটা মেজার গ্লাসে জল নিয়ে এসে মণীষার দিকে এগিয়ে ধরে) চট্ করে খেয়ে নিন।

(মণীষা চোখ বুজে সহাস্যে অষুধটা খেয়ে নিয়ে) বাববা, অষুধের কি তেজ, ঝাঁঝ!

সমর : খাঁটি অষুধের অমন ঝাঁঝ হয়। অবশ্য খাঁটি মানুষের ঝাঁঝটাও কম নয়। যেমন ধরুন...

মণীষা : আপনি নিজেকে খুব খাঁটি মানুষ বলে মনে করেন নাকি?

সমর : আরে ছ্যেঃ। আমি নিজের কথা বলছিনে; বলছি, আপনার দাদার কথা। নীতিবাদ, পাকা বেচেলর সুখেনের কথা। মেজাজটা বড় বেশী কড়া। সত্যি নয় কি বলুন?

মণীষা : (দাঁড়িয়ে উঠে) আমার দাদার নখের যোগ্যতা। যদি আপনার থাকত তো বুঝতুম...

সমর : যা বলেছেন। আমার বন্ধুদের হাতের নখের মধ্যে ওর নখটাই সব চেয়ে বড়।

সুখেন ঃ রাবিশ্। ডাক্তার হবে সভ্যভব্য গম্ভীর প্রকৃতির। আমি হলপ করে বলতে পারি তোর কোনদিন পসার হবে না।

সমর ঃ জানিস তো স্ত্রী ভাগ্যে ধন। বিয়ে না করলে পুরুষের ভাগ্য ফেরে না তাই ভাবছি একটা বিয়ে করেই ফেলব। কিন্তু কাকে ?

সুখেন ঃ তোর কাছে কে মেয়ে দেবে ?

সমর ঃ (আড চোখে মণীষাব দিকে তাকিয়ে) যার গরজ। জানিসতো গরজ বড় বালাই।

মণীষা ঃ (সুখেনকে ঘন ঘন তাগিদ দিয়ে) চ'ল দাদা। দেরী হয়ে যাচ্ছে। মা হয়ত ভেবে সাড়া হচ্ছেন।

সমর ঃ রোদ্দুরে কষ্ট হবে। আমিও এখন চেম্বার বন্ধ করব, চলুন আমিই পৌঁছেদি।

সুখেন ঃ থাক্, তোকে আর কষ্ট করতে হবে না। তা'ছাড়া গাড়ী চড়ে অভ্যাসটা খারাপ হয়ে যাবে।

মণীষা ঃ যা' বলেছ দাদা, চল।

(দু'জনেরই প্রস্থান)

সমর ঃ (চেঁচিয়ে) আমি ও বেলা যাব। মাসীমাকে বলিস, রাত্তিরে ওখানেই খাব।

(পর্দা নামল)

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান রমেনের বাড়ী, বারান্দা। সময় সন্ধ্যা বিভাবতী তার প্রতিবেশিনী বিধবা সুলতা দেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।]

সুলতা দেবী : শুনলাম তোমার ছেলে নাকি বৌকে হাসপাতাল থেকে আনতে গেছে।

বিভাবতী : আজ সন্ধ্যেই ফেরার কথা।

সুলতা : বউকে ঘরে নেবে ?

বিভাবতী : জানতো কর্তার ইচ্ছায় কীর্ত্তন। ছেলে এখন বড় হয়েছে।

সুলতা : (চোখ দুটো কপালে তুলে)

বল কি ? মহারোগে যে বউ ভুগেছে তাকে ঘরে নেবে ? সে হাড়ি হেসেল ছোঁবে, পূজার ঘরে ঢুকবে, তোমার রান্না করে দেবে ?

বিভাবতী : না, না, আমার রান্না করার ভার তার হাতে দোব না। কথায় বলে ও রোগের বীজ সাত হাত মাটির নীচ অবধি যায়।

(খুশীর ভাব দেখিয়ে)

সুলতা : যা বলেচ। বলি যত আধুনিকতার দোহাই

দাওনা কেন, বিজ্ঞানের তারিফ করনা কেন, আমরা হিন্দু ঘরের বিধবা ; আচার বিচার আমাদের মানতেই হবে। কপাল পুড়েছে, কিন্তু আক্কেল বুদ্ধি সব শেষ হয়ে যায় নি। বলি, এখনও সূর্য পূবদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়।

বিভাবতী ঃ কিন্তু কে শোনে ? ছেলের জিদ সে বাড়ী আনবেই। ডাক্তার বলেছে নাকি সেরে গেছে, আর ভয় নেই।

সুলতা ঃ (শিউরে ওঠে) ভয় নেই ? কাছে গেলেই গা ঘিন ঘিন করে। ও দেহ গঙ্গায় শত ডুব দিলেও শুদ্ধ হয় না। ও রোগ কি যে-সে রোগ ! (একটু থেমে)

তুমি ও-সব কথায় কাণ দিয়ো না, তোমার ভালোর জন্যই বলছি। ছোট বেলা একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি, মানুষ হয়েছি তাই-না প্রাণের টানে বাড়ী বয়ে এলাম। নইলে এ রোগ যে বাড়ীতে ঢুকেছে সেখানে কেউ আসে ? এই যে শোভার মা, যে তোমার পোড়া বাসন মাজে উনুন নিকোয়, সে

আমাকে এদিকে আসতে দেখেই বললে, খবরদার ও বাড়ী যেওনি, সেখানে বৌদির মহারোগ হয়েছে।

বিভাবতী ঃ যাদের প্রাণের টান আছে তাদের কথা আলাদা। যা'রা গতর খাটিয়ে খায় তা'দের কথা আলাদা। ওদের আবার দয়া মায়া কি ? সবই টাকা, আঁচল ভরতি টাকা দাও লুকিয়ে এসে কাজ করে যাবে।

সুলতা ঃ যা' বলেছ। ওদের আবার ভাল মন্দ। (একটু ভেবে) যাকগে ও-সব কথা। কোলের ছেলেটার কী হবে ?

বিভাবতী ঃ কি আর হবে ? এখন আমার-ই কাছে আছে।

সুলতা ঃ ও হলো তোমার পরিবারের ভবিষ্যৎ। ওর ভাল মন্দ দেখতে হবে। কুষ্ঠি মায়ের কোলে গেলে আর দেখতে হবে না! ও বড় হয়ে স্কুলে পড়তে পাবে না, বিয়ে হবে না, চাকরি পাবে না।

(সহানুভূতির স্বরে) তোমার ভালর জন্যই

বলছি, তোমার শ্বশুরের ভিটের মঙ্গলের জন্যই বলছি, নইলে আমার কী ?

বিভাবতী ঃ (দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে) কী করব ! যা বাইরের লোকে বোঝে তা পেটের ছেলে বোঝে না। এখন আমি কি করি ! আজ যদি উনি বেঁচে থাকতেন !

সুলতা ঃ কর্ত্তা নেই ; তুমি তো রয়েছ। পস্ট বলে দাও, এখানে বউকে আনা চলবে না। শ্বশুরের ভিটে কলুষিত হতে দিয়োনা। থাক আমি উঠি, অনেকক্ষণ এসেছি। ওদিকে ভাই এর বৌ বোধ হয় রেগে অগ্নিশর্মা। পরের অন্ন খাওয়া যে কী জ্বালা, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। (উঠে দাঁড়াল)

বিভাবতী ঃ (একটু চিন্তিত ভাবে) ওই উপসর্গটি এসে পড়লে কী যে করব, ভেবে পাইনে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করতে হয়। নইলে আমার কি, একটা তো পেট।

সুলতা ঃ (একটু চাঁপা কণ্ঠে) আর একটা কথা মনে রেখ। বউকে এখানে তুললে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে।

আরো কত কি? খরচান্ত হয়ে মরবে।
মনে রেখ গরীবের কথা বাসি হলে ফলে।

(বলতে বলতে সুলতা দেবীর প্রস্থান। রিক্সা থামার শব্দ শুনে বিভাবতী উঠানে নেমে এলেন। বীণা ও রমেনের প্রবেশ। রমেনের হাতে বীণার সুটকেশ।)

বীণা ঃ (খুশী হয়ে) মা, আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি। ডাক্তার বাবু বললেন, আর ভয় নেই। [প্রণাম করতে গেল শ্বাশুড়ীকে। বিভাবতী দু'পা পিছিয়ে গেলেন]

বিভা ঃ থাক্ থাক্, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক বৌমা। আগে পূজো স্বস্ত্যয়ন হোক, তারপর ঘরে যাবে!

বীণা ঃ কিসের পূজো মা?

বিভা ঃ প্রায়শ্চিত্তি হবে না?

রমেন ঃ প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন আসছে কেন মা? যক্ষ্মা-রোগী ভাল হয়ে এলে কি তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়!

বিভা ঃ কী যা' তা বলছিস রমু? কিসে আর কিসে! মহারোগের সঙ্গে কি অন্য রোগের তুলনা হয়?

বীণা ঃ মা এসব কী বলছেন?

বিভা ঃ অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না বাছা! আমাকে গাঁয়ের পাঁচজনকে নিয়ে থাকতে হয়। সমাজের মধ্যে থেকে সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলে না।

[বীণা অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল স্বামীর দিকে]

রমেন ঃ (স্বগতঃ) কী যে করি। মার গোঁ ভাঙা সহজ নয়। অথচ...

বীণা ঃ তোমার কী মত?

রমেন ঃ একটু ধৈর্য ধর।

বীণা ঃ উপদেশ আর ভাল লাগে না। ঘরে ঠাঁই দেবে বলেই হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছ। তা' নয় কি?

রমেন ঃ আস্তে, চেঁচিয়ো না।

বিভা ঃ (রমেনকে উদ্দেশ্য করে) বৌমাকে আপাততঃ বাইরের খড়ির ঘরটায় থাকতে বল। পরে পূজাটুজা হলে বন্দোবস্ত করা যাবে।

বীণা ঃ (রমেনকে) না, আমি ঘুঁটে আর খড়ির ঘরে কিছুতেই থাকতে পারব না। যদি এ বাড়িতে রাখতে হয় তা'হলে যথার্থ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েই রাখতে হবে।

রমেন ঃ উত্তেজিত হয়ো না বীণা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিভা ঃ চেঁচিয়ো না বৌমা। পাঁচ কাণ হলে আর বাড়িতে তিষ্ঠুতে পারব না। গাঁয়ের লোকেরা জানে তুমি বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছ।

বীণা ঃ ঘুঁটে আর খড়ির ঘরে বন্দী করলে ব্যাপারটা বুঝি জানাজানি হবে না ?

বিভা ঃ (ধমকের সুরে) ভর সন্ধ্যে বেলা উঠানে দাঁড়িয়ে আমার মুখের উপর কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না বৌমা ?

(রমেনকে উদ্দেশ করে) রমু দেখ, তোর বউ-এর কাণ্ডখানা! হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে যেন রণচণ্ডী হয়েছে। তোর বউ তুই সামাল দে বাবা! আমি অত ঝঞ্ঝাট পোহাতে পারব না, আমার পূজা আহ্নিক আছে।

[প্রস্থান]

বীণা ঃ বেশ, তুমিও এবার মা'কে অনুসরণ করে

ঘরে চলে যাও। আমি বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে থাকি রাত ভর।

রমেন ঃ কেন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে? তুমিও আমার সঙ্গে ঘরে যাবে।

বীণা ঃ কই, তোমাদের কথা বার্তা বা আচরণে তা তো মনে হচ্ছে না। এককালে যখন আমি নীরোগ ছিলাম, কত আদর যত্নই না পেয়েছি এ বাড়ী থেকে। আজ...(চোখে আঁচল দিল) বেশ তোমরা যদি আশ্রয় না দাও, ঘরে না নাও, খোকাকে আমার কাছে দাও, আমি তাকে নিয়ে আমার মা'র কাছে চলে যাচ্ছি।

[বাবান্দাব সংলগ্ন ঠাকুব ঘব থেকে চেঁচিয়ে বলতে বলতে বেবিয়ে এলেন বিভাবতী]

বিভা ঃ না, খোকন এ বাড়ির বংশধর, এ সংসারের ভবিষ্যত। তাকে তুমি পাবে না। যেতে হয় একাই যাও।

বীণা ঃ আমি মা হয়ে তার কেউ নই?

রমেন ঃ (মাকে) বীণা এ বাড়ীর বৌ, এ বাড়ির বংশধরের মা। তার সম্পূর্ণ সামাজিক দাবী আছে। তা' ছাড়া আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব

আছে তার প্রতি। অসুখের অজুহাতে তাকে অযথা হেনস্তা করার কোন মানেই হয় না। অসুখ হলেই যদি বাড়ি থেকে আলাদা করে রাখতে হয়, তাহলে পরিবারের আভিজাত্যের ও শিক্ষার গর্ব করা চলে না।

বিভা ঃ (বাগত ভাবে) বৌ-এর হয়ে ওকালতি করছিস কর। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলছি, পুজা প্রায়শ্চিত্ত না করে ওকে আমি ঘরে নেবনা! তা'ও পাঁচজনে যদি মত দেয়।

রমেন ঃ পাঁচজনের মত নিয়ে বৌ করে ঘরে আননি বীণাকে। বীণাকে একদিন সব চেয়ে বেশি আদর তুমিই করেছিলে, আজ ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা'কে দূরে ঠেলে রাখতে চাইছ। একি অন্যায় অত্যাচার নয়? আজ যদি তোমাকে বা আমাকে এ অবস্থায় পড়তে হত ?

বিভা ঃ আসল কথা হচ্ছে, তুই অনাছিঁষ্টি করবি, তবে ছাড়বি। আজ যদি উনি বেঁচে থাকতেন তা হলে আমাকে নিজের ছেলের মুখে এসব শুনতে হত না। [চোখে আঁচল]

বেশ, তুই তোর বউ নিয়ে থাক আমার যে দিকে চোখ যায় চলে যাব। আমার আর কি, তিনকাল গিয়ে এককাল আছে। কর্ত্তা যেদিন স্বর্গে গিয়েছেন সেদিনই এ সংসার থেকে আমার ঠাঁই উঠে গেছে। কলি, ঘোর কলি।

রমেন : মা, তুমি অযথা ব্যাপারটাকে ঘোরাল করে তুলছ, আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ নিজে কষ্ট পাচ্ছ। ও বেচারকেও কাঁদাচ্ছ।

বিভা : আমাকে লোকে ভাগ্যবতী মা বলে। দেখে যাক্ গাঁয়ের লোক, ছেলে আমার কি রকম অপদস্ত করছে। বৌ-এর হয়ে ওকালতি করছে।

[বলতে বলতে কেঁদে ভেঙে পড়ল]

রমেন : খুবই বাড়াবাড়ি করছ মা। কই, তুমি তো এমন ছিলে না। কুসংস্কারকে তুমি এমন ভাবে আমল দেবে ভাবতেও পারিনি। আমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা একজন অসহায় মেয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে কষ্ট দেবে!

বিভা ঃ খুব হয়েছে। আমারই ভুল হয়েছে। নিজের পেটের ছেলেকে এতদিন চিনতে পারিনি। না ঠেকলে কি কেউ শেখে! আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দে। এক কোশ পথ, আমি নিজেই যেতে পারব। তোর সংসারের কোন জিনিষ আমি ছোঁবনা। থাক তুই তোর বউকে নিয়ে।

[রাগে গজ-গজ করতে করতে বিভাবতী ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে পরনের থান কাপড়টা বদলে বাইরে এলেন। হাতে একটা পুরানো সুটকেস।]

রমেন : ও কী হচ্ছে! তুমি লোক না হাসিয়ে ছাড়বেনা দেখছি। যাও, ঘরে যাও।

বিভা ঃ না, আমি কিছুতেই ফিরে যাবনা। ও ঘর সংসার আমার নয়, তোর বৌ এর; সেই থাক। ও পাপ নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না বলছি। শেষে কি নরকে যাব? নিজেকে, সমাজকে, গাঁয়ের দশ জনকে ডোবাব!

রমেন ঃ আশ্চর্য ! তুমি কুসংস্কারকে বড় করে দেখে সত্যকে অস্বীকার করবে ! মানুষের থেকে তোমার কুসংস্কারটা বড় হল ?

বিভা ঃ বল, আমার মা দিদিমা পূর্বপুরুষ, আর মহানন্দ সরস্বতীর বংশধরের শিক্ষা দীক্ষা সব মিথ্যা। আর তোর শিক্ষাই খাঁটি সত্যি ! আমি মূর্খ !

[এমনি সময় বাইরে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

আগন্তুক ঃ মাসীমা, মাসীমা, বাড়ী আছ ?

বিভা ঃ কে, কে ডাকছে ?

[ততক্ষণে সমর রায় উঠানে এসে দাঁড়াল]

সমর ঃ মাসিমা আমি ! সমর।

বিভা ঃ হঠাৎ কোত্থেকে ?

[সমর বিভাবতীর পায়ে প্রণাম করলেন]

সমর ঃ কেমন আছ সব !

বিভা ঃ আর আছি !

[রমেন এগিয়ে গিয়ে সমরকে প্রণাম করল। বীণা এগিয়ে যেতেই বিভাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন]

বিভা ঃ ওর পায়ে হাত দিয়োনা বৌমা।

[বীণার মুখটা অপমানে নীল হয়ে গেল]

সমর ঃ ব্যাপার কী আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। তোমরা কী কোথাও যাচ্ছ নাকি! সবাই উঠানে দাঁড়িয়ে, দুটো স্যুটকেস বাইরে, অবশ্য আমারটা নিয়ে তিনটে। এমন অদ্ভুত একখানা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হবে ভাবতে পারিনি।

বিভা ঃ জীবনটাই নাটক বাবা। এ সংসার এককালে আমার ছিল, এখন আর নয়। আমি চললুম।

সমর ঃ ব্যাপারটা কি ?

[রমেনের দিকে তাকিয়ে]

রমু, কী হয়েছে খুলে বল।

বিভা ঃ হ্যা তোর ভাইকেই বলতে বল।

রমেন ঃ (সমরকে) তুমি ডাক্তার। ব্যাপারটা বুঝবে ও বোঝাতে পারবে মাকে।

[হতভম্বের দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সমর]

প্রায় মাস আটেক আগে বীণার হাতের একটু উপরে ফিকে দাগ ফুটে উঠেছিল! ডাক্তারের পরামর্শে তাকে সদরে কুষ্ঠ হাসপাতালে দেখান হয়! প্রমাণ হল ওগুলো, কুষ্ঠ। ভর্তি করা হল। এখন সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে

কিন্তু প্রবেশ নিষেধ। মা বলছেন, পূজা স্বস্ত্যয়ন আর কি কি সব না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ঢোকার প্রশ্নই আসে না। বল তো কী অন্যায় কথা !

সমর : তারপর মাসীমার হাতে স্যুটকেশ কেন ?

রমেন : বীণাকে ঘরে নিলে তিনি এ বাড়ীতে থাকবেন না।

[সমর হোঃ হোঃ করে সশব্দে হেসে উঠল]

সমর : এই ব্যাপার ! সকলেরই মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি।

[বিভাবতীকে উদ্দেশ করে]

ও মাসীমা, রোগ তো সেরে গেল। আবার তোমার সন্দেহটা কেন ?

বিভা : তুই বল বাবা, ও রোগ কখনও সারে ? কাউকে সারতে দেখেছিস ?

সমর : নিশ্চয় সারে এবং সম্পূর্ণভাবেই সারে ! যক্ষ্মা সম্বন্ধেও তোমাদের এক কালে এই রকম ভয়ঙ্কর ভয় ছিল।

রমেন : মাকে তুমি বোঝাও সমরদা। আমি হায়রাণ হয়ে গিয়েছি। যা বলছি উল্টো বুঝছেন।

সমর ঃ তোমাদের মা-ব্যাটার তর্ক যুদ্ধের মীমাংসা, না হয় পরেই হবে। তার জন্যে বীণা কেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে? তাকে ঘরে যেতে দাও। খোকন কোথায়?

রমেন ঃ সে আছে। তা'র দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দেবো ভাবছি।

সমর ঃ আর সেখানে পাঠাবার দরকার নেই। ঘরের ছেলে ঘরেই থাকবে। মার কাছে ছেলে না থাকলে ছেলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়।

বিভা ঃ কী যা তা বলছিস সমু। তোরা সব একদলের। আমার দেখছি কিছুতেই আর এ বাড়ীতে থাকা চলে না। আজ যদি তোর নিজের বেলায় এরকম হত?

সমর ঃ (হেসে) হত কী, হয়েছে!

বিভা ঃ সে কী রে?

সমর ঃ আমি একজন সদ্য কুষ্ঠ-রোগমুক্ত মেয়েকে বিয়ে করেছি। খবরটা অবশ্য দেওয়া হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ হয়ে গেল তাই।

বিভা ঃ কি যা তা বলছিস সমু!

সমর : যা তা নয়, সত্যি বলছি মাসীমা। আমি জানি ও রোগ সেরে গেলে আর কোন ভয় থাকে না। তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ।

বিভা : কী যে বলছিস বুঝি না। কি রকম যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব। তাহলে রমু যা বলছে তা ঠিক?

সমর : উচ্চশিক্ষিত ছেলে মার কাছে কি আর মিথ্যে কথা বলবে!

রমেন : আমি বার বার বলছি, মা, এ তোমার ভুল ধারণা, কিন্তু মার গোঁ ভাঙ্গে না।

সমর : কুসংস্কার যে আমাদের কত বড় শত্রু তা বলে শেষ করা যায় না। (বীণাকে উদ্দেশ করে) এস মাসীমাকে প্রণাম কর।

[বীণা সসংকোচে এগিয়ে এল। এবার বিভাবতী আর পা টেনে নিলেন না। সমরকেও প্রণাম করল বীণা]

সমর : তুমি ভুল বোঝনা বোন।

[কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল বীণা সমরের দিকে রমেনকে উদ্দেশ্য করে]

সমর : (রমেনকে) যাও হে হিরো, বীণার স্যুটকেসটা নিয়ে গৃহপ্রবেশ কর।

[তারপর বিভাবতীর দিকে তাকিয়ে]

মাসীমা বীণাকে নিয়ে ঘরে যান। সংকোচের

কোন কারণ নেই। আমি ডাক্তার, আমি বলছি কোন ভয় নেই।

বিভাবতী ঃ তুই বলছিস ? দেখ দিকিনি, ভর সন্ধ্যেবেলাটা এখানে দাঁড়িয়ে বকালি। আচ্ছা ছেলে যাহোক।

[বীণাকে উদ্দেশ্য করে]

যাও তো বৌমা, ঠাকুরঘর থেকে গঙ্গা জলের বোতলটা নিয়ে এসো তো। সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে আবার ঘরে ঢুকব ? জল একটু ছিটিয়ে দেওয়া ভাল।

[বীণার প্রস্থান]

সমর ঃ (স্বগতঃ) ওঃ কি ভয়ঙ্কর ষ্টীগমা ! মাসীমা দেখছি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বার বার করছেন। আশ্চর্য কুসংস্কার !

রমেন ঃ সমরদা আর কাল ক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি চলে এস। কুসংস্কারের কেউটে সাপটী আবার কখন ফণা তুলবে কে জানে !

[বীণা গঙ্গা জলের বোতলটা এনে শ্বাশুড়ীর হাতে দিল]

বিভা ঃ এই দেখ, বলি পরণের শাড়ীটা বদলে নিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলে ত ?

বীণা ঃ হাঁ মা। এ যে আমার বহুদিনের অভ্যাস।

বিভা ঃ বাঁচালে মা ! আমি ভাবছিলাম, এ ক'দিনে ভুলে গেছ বুঝি !

সমর ঃ জানো মাসীমা, মেয়েরা ভরত পক্ষীর মত। ভরত পক্ষী আকাশের যত উঁচুতেই থাকনা কেন, দৃষ্টিটা তার থাকে পৃথিবীর দিকে। ঠিক তেমনি মেয়েরা যত দূরেই থাকনা কেন, মনটা পড়ে থাকে নিজের সংসারের দিকে। তারা সহজে ভোলে না। তাঁদের আচার রীতি নীতি।

বিভাবতী ঃ [হেসে] তোর কিছুই অজানা নেই দেখছি।

সমর ঃ শুধু একটা কথা অজানা ছিল মাসীমা। সেটা হচ্ছে, তোমার মনের কুসংস্কার, এখনও পুরো-পুরি কাটেনি দেখছি।

বিভা ঃ [ধমকের সুরে]
থাম হতভাগা। তুই এতটুকু বদলাস নি দেখছি। ঠিক আগের মতই ফাজিল আছিস। এখন বৌকে কবে আনবি বল ?

সমর ঃ এলে তাকে ঘরে নেবে তো ?

বিভা ঃ এনেই দ্যাখ, নিই কিনা !

সমর ঃ সাবাস্। (বলেই সানন্দে একটা হাতের তুড়ি দিল। নেপথ্য থেকে মণীষা সহাস্যে প্রবেশ করল।)

বিভা ঃ ওমা, এ কে ? ঠিক যেন লক্ষী প্রতিমা !

সমর ঃ (হেসে) এই সেই বউ। যার কথা হচ্ছিল। মণীষা প্রণাম করতেই বীণাও এগিয়ে গিয়ে শাশুড়ীকে প্রণাম করল। দু'জনকেই চিবুক স্পর্শ আদর করলেন বিভাবতী।

বিভা ঃ (সমরকে ভর্ৎসনা স্বরে) সন্ধে বেলা, বউমাকে বাইরে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে এখানে রগড় করছিস। বলি, তোর ছেলেমানুষী কি আর যাবে না! দিনকে দিন কী হচ্ছিস তোরা সব বলত!

রমেন ঃ (হেসে) আধুনিক ছেলেমেয়েরা এসব করেই থাকে মা। (স্বগতঃ) যাক্, আমরাও আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যটা সেরে ফেলি। (এগিয়ে গেল মণীষাকে প্রণাম করতে। বীণাও এগোল। মণীষা দু'পা পেছনে সরে গেল।)

মণীষা ঃ না, না, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হবে না।

রমেন ঃ যা'র যা প্রাপ্য ছাড়া উচিত নয়, বৌদি। তা'ছাড়া রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে একবার, আবার চালু করা শক্ত।

মণীষা ঃ হাত জোড় করে প্রণাম করাই ভাল। (বীণা কাছে যেতেই তার হাতটা ধরে ফেলল।)

রমেন : (মণীষাকে) বয়সে ছোট হলেও সামাজিক পদবীটা তো বড়। কাজেই প্রণামটা নেওয়া উচিত ছিল।

বিভা : ছোটরা গুরুজনদের প্রণাম করবে এতো সোজা কথা।

সমর : (হেসে) মাসীমা তোমাদের অভিধানে যে মানে লেখা আছে সে মানে আধুনিক ছেলেমেয়েদের অভিধানে নেই। যুগের সঙ্গে সব ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। এখন সবাই সবাইকার বন্ধু। জ্ঞানীরা বলেন, পুত্র যদি ষোল বছরে পদার্পন করে, তার সঙ্গেও বন্ধুর মত আচরণ করতে হয়, বুঝলে ?

বিভা : কি জানি বাবা! তোদের হেয়ালী অতশত বুঝিনে। কখন যে কি করছিস, বলছিস, কিছুই বুঝতে পারছি নে। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। যাক্ তোরা যা খুশী কর। (এগিয়ে গিয়ে এক হাতে মণীষাকে ধরে) চল, বৌমা ওদের কচকচানি শেষ হবে না। ঘরে চল। (বীণাকে উদ্দেশ করে) পাশের ঘরটায় ওদের খাবার যায়গা করে দাও। (বীণা ও বিভাবতীকে অনুসরণ করল)

সমর ঃ বাঃ বাঃ। কথায় বলে না, আমে দুধে মিশে গেলে আঁটি গড়াগড়ি যায়।

বিভা : (সহাস্যে ঘরের দিকে যেতে যেতে) জানিসনে হতভাগা, কান টানলে মাথা আসে।

সমর ঃ (রমেনকে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? দেখছিস নে চোখের উপর দিয়ে দু'জোড়া—কাণ চলে গেল। চল, চল। সুটকেশগুলো তুলে নে। (সকলে সশব্দে হেসে উঠল পর্দা নামল)

—যবনিকা—

শুদ্ধি : প্রথম দৃশ্যের সময় 'সন্ধ্যার' পরিবর্তে 'সকাল' হবে।